ঃ এই সংখ্যায় ঃ
১) স্টিফেন হকিং
২) এ কেমন গান্ধী -রবীন্দ্রবাদী ?
৩) আন্তর্জাতিক রসায়ন বিদ্যা পর্ষদ , ৪) ভূমিকম্পে সাবধানতা অবলম্বন, ৫) সূর্য শহর,

বিজ্ঞান অন্বেষক

গ্রাহক মূল্য
বার্ষিক ১৫ টাকা, যোগাযোগ ঃ বিজ্ঞান অন্বেষক, প্রযত্নে : বিজ্ঞান দরবার, ৫৮৫ অজয় ব্যানার্জী রোড, (বিনোদনগর)
পোঃ কাঁচরাপাড়া-৭৪৩১৪৫
জেলা ঃ উত্তর ২৪ পরগণা।

বর্ষ-৮ সংখ্যা - ৬ নভেম্বর-ডিসেম্বর/২০১১ RNI No. WBBEN/03/11192 মূল্য : ২

সার্ধশতবর্ষে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় কেন অবহেলিত ?

সার্ধশতবর্ষে আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় (১৮৬১-১৯৪৪) চর্চা অনেকের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। বাঙালি জীবনের বিবিধ সঙ্কটমোচনে প্রফুল্লচন্দ্রের প্রয়াস যেমন প্রাসঙ্গিক তেমনি শিক্ষনীয়। বাঙালির শিল্পদ্যোগ ভাবনার তিনি অন্যতম পথিকৃৎ ও স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব। ব্যক্তি জীবনে কৃচ্ছসাধন, আড়ম্বর-বিলাসিতা বর্জন, পোশাক পরিচ্ছদ ও দিনযাপনে সরলতা যেমন বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে, তেমনি তাঁর গঠনচিন্তার প্রতি তীব্র অনুরাগ ও দেশব্যাপী প্রয়াস এক অসামান্য কর্মোজ্জ্বল জীবনচর্যা। ভারতে বিস্ময় লাগে তাঁর মৃত্যুর পর (১৯৪৪) তাঁর অধিকাংশ বইপত্র বাজার থেকে উধাও। তাঁর কীর্তিমান ছাত্রদলও সেভাবে আচার্যের জীবনসাধনার প্রচার ও সংরক্ষণে তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য প্রয়াসও নিলেন না। ১৯৫৫ সালের ঘটনাটা তো সর্বৈব লজ্জার ও ক্ষোভের। তাঁর অতি প্রিয় ও আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন অজৈব রসায়ন বিজ্ঞানী প্রিয়দারঞ্জন রায়ের নেতৃত্বে 'A History of Hindu Chemistry' বই এর নাম পরিবর্তন করে করা হল 'History of Chemistry in Ancient and Medieval India'। বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় বাদ দেওয়া হল। এমন কিছু নতুন বিষয় সংযোজিত হল, যা বইটির আগের চরিত্রকেই যেন বিদ্রুপ করছে। অধ্যাপক প্রিয়দারঞ্জন রায়ের সম্পাদনায় এটি প্রকাশিত হলেও, এমন অনেক ব্যক্তিত্বই তাঁর পাশে ছিলেন, যাঁরা আচার্যের অতিশয় প্রিয়ভাজন ছাত্র মন্ডলী।

কেন এমন হোল ? প্রিয়দারঞ্জন

এরপর 2 পাতায়

বাংলার সাদা বাঘ

"এক ছিল মোটা কেঁদো বাঘ, গায়ে তার কালো কালো দাগ।"

রবি ঠাকুরের এই ছড়া ছোটবেলায় প্রায় সব বাঙালিই পড়েছে। আর পড়ে স্বচক্ষে বাঘ দেখার আগেই বাঘের একটা কাল্পনিক চেহারা মনে এঁকে নিয়েছে। তাছাড়া, দাদু-ঠাকুমার মুখে বাঘের গল্প শোনেনি এমন হতভাগ্য বাঙালির সংখ্যা কিন্তু ইদানিং কালে অনেক বেড়ে গেলেও অদূর অতীতে যৌথ পরিবারিক ব্যবস্থায় এমন বাঙালি ছিল খুব কম। ছবি-ছড়া-গল্পে যে জন্তুটির সবচেয়ে বেশি উপস্থিতি, যে হল বাঘ, আর বাঘ মানেই সুন্দরবনের বাঘ। বিরাট লম্বা চেহারা, হলুদের ওপর কালো ডোরাকাটা গা। লম্বা লেজ, তীক্ষ্ম দাঁত, ভয়ঙ্কর শক্তি আর হিংস্র, কিন্তু ছোটবেলায় আলিপুর চিড়িয়াখানায় গিয়ে অবাক হয়ে দেখেছিলাম সাদা রঙের বাঘ 'চাঁদনি'। পরে ওড়িশার নন্দন কাননে জানলেও দেখেছি। সবই সুন্দরবনের রয়্যালবেঙ্গল টাইগারের মতো, কেবল গায়ের রঙ ছাড়া। হলুদের বদলে সাদা, কালো ডোরা ঠিকই আছে, তোমরাও হয়ত এমন সাদা বাঘ চিড়িখানায় দেখেছো; কিন্তু এরা এলো কোথা থেকে? কী এদের বিশেষত্ব? কেনই বা এদের শুধু চিড়িয়াখানাতেই দেখতে পাই? জঙ্গলের প্রাকৃতিক পরিবেশে কি

এরপর 4 পাতায়

বিরল ডাক্তারবাবু

আজ যে ডাক্তারবাবুর কথা লিখব তাঁর সাথে আমার পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন 'উৎস মানুষ' পত্রিকার (বিজ্ঞান পত্রিকা) সম্পাদক, বর্তমানে প্রয়াত অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রথম পরিচয়ে অত্যন্ত রাশভারি, চৌকো মুখ এবং প্রচলিত ধারার বিপরীত কথা বলা মানুষটাকে ভালো লাগেনি। সাইড ব্যাগ থেকে একটা চটি বই বার করে আমার হাতে দিলেন। সালটা ১৯৮৭ তখন আমার বয়স ২৭ বছর। বইয়ের নাম 'মানুষের জন্য ওষুধ না ওষুধের জন্য মানুষ' ড্রাগ অ্যাকশন ফোরামের বই। কেন এই বই প্রশ্ন ড্রাগ অ্যাকশান ফোরামকে। একটা পোস্টকার্ডে চিঠি লিখেছিলাম তার উত্তরে ডাক্তারবাবু লিখলেন, উৎস মানুষের আড্ডায় দেখা হলে বিস্তারিত বলব। এই ডাক্তারবাবু হলেন সজিত কুমার দাশ। গত ২০/৪/২০১১ তারিখে তিনি প্রয়াত হন। অকৃতদার এই মানুষটির জীবনের সাথে সাহিত্যিক শিবরাম চক্রবর্তীর শেষ জীবনের দারুন মিল। সারা জীবন পরিবারের সবার জন্য ও বিজ্ঞানমনস্কতার আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ায় ব্রতী

এরপর 7 পাতায়

1 পাতার পর

কেন অবহেলিত

রায় সর্বতোভাবে উপনিষদ প্রাচীন ভারতীয় দর্শণ ও বৈদিক কৃষ্টি সভ্যতার গোড়া সমর্থক ছিলেন। জাতপাত মানতেন। মনু-শঙ্করাচার্যের প্রয়াসকে সমর্থন দিয়েছেন। আত্মা, পরমেশ্বর, যাগযজ্ঞ এসবেও প্রবল বিশ্বাসী। তাঁর একাধিক বাংলা ও ইংরাজি রচনায় ও বইতে চোখ বোলালে এগুলি সহজেই ধরা পড়বে। ফলে সংশোধিত যে বই বেরোলো তা আচার্য রায়ের সারা জীবনের সাধনা ও মর্মকথাকে ধূলিসাৎ করলো। শোনা কথা, এই প্রয়াসের অন্যতম সহযোগী অধ্যাপক সুশীল কুমার মুখোপাধ্যায় পরে নাকি বলেছিলেন, এই কাজটা আমার জীবনের একটি কলঙ্কজনক পাপ কাজ হিসাবে চিহ্নিত হবে।

অধ্যাপক দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় একমাত্র সেই সময় এর তীব্র প্রতিবাদ করেছিলেন এই প্রয়াসের। '....The new book gives us the sad impression of some kind of ideological retreat-retreat specially from the scientific temper on which P C Ray puts so much emphasis.

অতি নমোনমো করে আচার্যের শতবর্ষ, শতোত্তর রৌপ্যজয়ন্তীবর্ষ অতিবাহিত হয়েছে। বাজারে তাঁর কোনও নিজস্ব রচিত বইপত্র পাওয়া যায় না। দু'একটি অতি সাধারণ জীবনী গোছের বই, যা প্রায় অবহেলার নজির বিশেষ। কেন আমরা আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রকে ভুলে রইলাম? ১৯৪৪ থেকে ২০০০ পর্যন্ত বলার মতো কোনও কাজ কি কেউ করেছেন প্রফুল্লচন্দ্রকে নিয়ে? যাঁর নামে একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা জাতীয় কর্তব্যের অঙ্গ, সে জায়গায় একটি পলিটেকনিক কলেজ হয়েছে (যাদবপুরে) মাত্র তাঁর নামে। সার্ধশত বার্ষিকী জয়ন্তী উপলক্ষে তবু নানা জায়গায় আলাপ আলোচনা হয়েছে ও হচ্ছে।

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের লেখনী যেমন বলিষ্ঠ ও ক্ষুরধার সমালোচনায় তীক্ষ্ম, তেমনি গঠনমূলক ইতিবাচক মনোভাবেও সম্পৃক্ত। বিদ্যাসাগরীয় পথে আরও বিজ্ঞানমনস্কতায় ঋদ্ধ প্রফুল্লচন্দ্র প্রবলভাবে সমাজ সংস্কারত। সমকালীন বাঙালি ও ভারত-মনীষাদের থেকে তিনি ব্যক্তিজীবনে যেমন স্পষ্টবাদী ও আধুনিক তেমনি উপনিষদ-বেদান্তের দোহাই না পেড়ে পরকালের ভাবনাকে সমূলে উৎপাটন করতে জীবন উৎসর্গ করেছেন। এই নির্ভীক স্পষ্টতা আর কোনও ভারত খ্যাত ব্যক্তিত্বের মধ্যে দেখা যায়নি বলা চলে নির্দ্বিধায়। এ কারণেই কালের নীরব অবহেলায় প্রফুল্লচন্দ্র অনুচ্চারিত থেকেছেন দীর্ঘকাল। বন্যাত্রাণে ও দরিদ্র মানুষদের জন্য তিনি কত সাহায্য করেছেন, এটাই তাঁর একমাত্র পরিচয় এবং এতেই আমরা সন্তুষ্ট।

গত ৩/৪ বছরে পরিস্থিতির কিছুটা হলেও উন্নতি হয়েছে আংশিক হলেও আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের রচনা কিছু পরিমাণে পুর্নমুদ্রণে পাওয়া যাচ্ছে। পঃবঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় সমিতির প্রচেষ্টায় ২ খণ্ডে 'Portrait of a Man'—অধ্যাপক অনিল ভট্টাচার্য্যের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছে। বাংলা ও ইংরেজি দু'ভাষায় বিবিধ রচনা নির্বাচিত সংকলনের নিরিখে এখানে অনুর্ভুক্ত।

'Collected Research Papers of Sir P C Ray' —আরও একটি মূল্যবান প্রকাশনা। ১৯৫৭ সালে প্রকাশিত শতবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থে (দু'খন্ড), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আচার্য রায়ের গবেষণা বিষয়ে কিছু তথ্য মুদ্রিত করেছিলেন। পূর্ণাঙ্গ ভাবে তাঁর গবেষণা কাজ সম্পর্কে জানতে উপরোক্ত গ্রন্থটি খুবই সহায়ক।

১৯৬১ সালে প্রকাশিত আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র জন্ম শতবর্ষ পূর্তি স্মারক গ্রন্থ এবং ১৯৬২ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত 'Ach. P C Ray - Birth Centenary Souvenir Volume'—দুটি গ্রন্থে আচার্যের গুণমুগ্ধ ছাত্র ও অনুরাগীবৃন্দের মতামত ও বিশ্লেষণ পাওয়া যায়। দুটি প্রয়াসই গুরুত্বপূর্ণ। পরে 'স্মৃতিসত্তায় আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র' গ্রন্থটিও বিশেষ কাজের হয়েছিল।

গত ২০০৯-১০ সালে উত্তর ২৪ পরগনার নব ব্যারাকপুর এপিসি রায় কলেজ কর্তৃপক্ষ ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় যৌথ সহযোগিতাক্রমে চার খন্ডে 'আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় রচনা সংকলন' (বাংলা ও ইংরাজি দু'রকম রচনা) প্রকাশ করেছেন। এই প্রয়াস নিঃসন্দেহে মূল্যবান। এখানে তাঁর বৈজ্ঞানিক গবেষণা প্রয়াস বাদে অন্যান্য রচনার সিংহভাগ রয়েছে। অনুসন্ধিৎসু পাঠক ও গবেষকগণ এখান থেকে প্রভূত সাহায্য পেতে পারেন। খুব সম্প্রতি (২০১১) এঁরা 'The History of Hindu Chemistry' পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থটিও পুর্নমুদ্রণে প্রকাশ করেছেন। এই প্রয়াসে অধ্যাপক অনিল ভট্টাচার্যের আগ্রহ ও প্রয়াস বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। এক আলোচনায় তিনি জানিয়েছিলেন, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট সভার কার্যবিবরণী খাতায় আচার্যের যে সব উক্তি লিপিবদ্ধ আছে, তা সম্পাদনার মাধ্যমে একটি বই হিসাবে শীঘ্র প্রকাশিত হবে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রকাশিত (১৯৯৯-২০০০) 'আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় বিশেষ সংখ্যা'—একটি মূল্যবান প্রয়াস। মধ্যমগ্রাম-নবব্যারাকপুর থেকে প্রকাশিত 'মুখপত্র চেতনা' পত্রিকায় আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় বিশেষ সংখ্যাটি মনোযোগী পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। ২০১০ অন্বেষা পত্রিকা (বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ) প্রকাশিত বিশেষ সংখ্যাটি বর্তমান সময়ের একটি সাধু প্রয়াস।

জ্ঞান ও বিজ্ঞান পত্রিকার জুলাই ২০১০ সংখ্যাটি আচার্যকে নিয়ে বিশেষ সংখ্যা হিসাবে প্রকাশিত। এমন কাজ ছোটো বড়ো অনেক বিজ্ঞান পত্রিকায় কমবেশি আচার্যের জীবন ও কর্ম নিয়ে লেখা প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু একটা ব্যাপারে বাংলা বিজ্ঞান পত্রিকাগুলি আজও বেশ পিছিয়ে। সাম্প্রতিক সময়ে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, বুদ্ধদেব বসু, বিনয় মজুমদার, শিবনারায়ণ রায়, অম্লান দত্ত, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, স্বয়ং কবি সম্রাট রবীন্দ্রনাথ তো আছেনই, প্রমুখদের নিয়ে লিটল ম্যাগগুলি যে সব অসামান্য গুরুত্বপূর্ণ পরিশ্রমী সংখ্যা প্রকাশ করেছেন, তার পাশে বিজ্ঞান পত্রিকাগুলির প্রয়াস একান্তই নিষ্প্রভ ও ম্যাড়মেড়ে।

এক সময় খ্যাতনামা ড. সত্যচরণ লাহা মহাশয় সম্পাদিত 'প্রকৃতি' পত্রিকায় প্রসন্নকুমার রায় নামে একজন একাধিক সংখ্যায় 'আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের জীবন' বিষয়ে রচনা প্রকাশ করেছিলেন। ধরে নেওয়া যায় আচার্যের জীবদ্দশায় প্রকাশিত এই রচনাগুলি আচার্যের দ্বারা সংশোধিত।

এরপর 3 পাতায়

কেন অবহেলিত

2 পাতার পর

এখন প্রশ্ন-১) এই রচনাগুলি একত্রিত করে কি কোন বই প্রকাশিত হয়েছিল? ২) কে এই 'প্রসন্নকুমার রায়'? প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রথম ভারতীয় অধ্যক্ষ, কেম্বিজের গণিতের বাংলার বিখ্যাত পিকে রায় আমাদের কাছে সুপরিচিত। তিনি কি এই নিবন্ধগুলির রচয়িতা? যাই হোক 'প্রকৃতি' পত্রিকা থেকে লেখাগুলি সংকলন করে আচার্যের জীবনীগ্রন্থটি উপযুক্ত সম্পাদনায় প্রকাশ করা জরুরি।

কাঁচরাপাড়ার 'বিজ্ঞান দরবার' সংগঠনের পক্ষে জয়দেব দে আচার্য্যের একটি ছোটো জীবনী গ্রন্থ (১৬ পৃষ্ঠা) প্রকাশ করেছেন ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্দেশ্যে মাত্র ৩ টাকা মূল্যে। প্রকাশক হিসাবে তিনি ৩০,০০০ গ্রন্থ বিলি করেছেন আগ্রহী ছাত্র-ছাত্রীদের পরিমন্ডলে।

জীবনীগ্রন্থ হিসাবে নন্দলাল মাইতি মহাশয়ের গ্রন্থটি (আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের জীবনবেদ) বেশ ভাল। যথেষ্ট পরিশ্রমী প্রয়াস। এখানে অনেক কিছু খুঁটিয়ে দেখার পরিশ্রমী নজর আছে। ঐতিহ্য উত্তরাধিকার ও বিজ্ঞানী প্রফুল্লচন্দ্র - শ্যামল চক্রবর্তী গ্রন্থটি নানা কাজের জন্য সহায়ক।

আচার্যের সমগ্র রচনার সু-সম্পাদিত সংকলন (রচনাবলি) প্রকাশ একান্ত জরুরি। তাঁর সুবিস্তৃত 'চিঠিপত্র' এখানে ওখানে অবহেলায় ছড়িয়ে আছে। এই কাজ আজ অবধি কেউ করেননি অথচ অসম্ভব প্রয়োজনীয়। অনেক অজানা তথ্য বেরিয়ে আসবে এই প্রয়াস থেকে। আচার্যের সমকালীন বহু বিখ্যাত বাঙালি ও ভারতীয় মনীষাদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের ওঠা-পড়া জানা যাবে এ থেকে। কেন তিনি অল্প সময় 'ভারতীয় জনসঙ্ঘের' সদস্যপদ নিয়েছিলেন, এনিয়ে কোথাও কোন আলোচনা চোখে পড়ে না। তিনি গান্ধিজির 'চরকা ও কুটির শিল্পের' প্রবল ও একগুয়ে সমর্থক ছিলেন। অথচ গান্ধিজীর ঈশ্বের ভাবনা তিনি গ্রহণ করেননি কখনও। ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে যুক্ত থেকেও তাঁকে কি নাস্তিক বলা যায়? এনিয়ে কেউ কোথাও কোন আলোচনা কখনও করেছেন?

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র চর্চা আজও প্রাসঙ্গিক ও প্রয়োজনীয়। তাঁর রচনা শুধু বাঙালি জাগরণের জন্য নয়, সমৃদ্ধ ভারত গড়ার কাজেও হাতিয়ার। তাঁর একাধিক বাংলা রচনার ইংরাজি তর্জমা করে সংকলন প্রকাশ করা প্রয়োজন—সর্বভারতীয় পরিধিতে প্রচারের উদ্দেশ্যে। তাঁর বহু ইংরাজি রচনাও আছে, যার সংকলন এখনও দরকারী।

কমবেশি ১০ খন্ড প্রয়োজন হবে (প্রতি খন্ড ৫৫০ পৃষ্ঠা ধরলে) তাঁর রচনাবলি প্রকাশের জন্য (গবেষণাপত্র বাদে)। বিস্তৃত টিকা, সূত্র, নির্দেশ, তথ্যপঞ্জি এবং প্রাসঙ্গিক সম্পাদনার মাধ্যমে একাজ করতে হবে। পুরানো বানান পরিবর্তন করাও দরকার বলে মনে করি। রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকারের যৌথ সহযোগিতা ক্রমে বাংলা আকাডেমি, বা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বা সারস্বত কোন বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠানকে সুচারুভাবে এই কাজ সম্পন্ন করার জন্য অর্থ সাহায্য করা প্রয়োজন। সাধশতবর্ষে শুধু স্মরণ পুজো নয়, তাঁর আদর্শকে সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত করে শিক্ষা ও শিল্পের বিকাশ ভাবনায় মৌলিক পরিবর্তন আনাই হোক আমাদের সুচিন্তিত দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্য।

ভূমিকম্পে কি কি সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত

প্রাকৃতিক ও অপ্রাকৃতিক কারণে ভূ-ত্বক ক্ষণিকের জন্য কেঁপে উঠলে তাকে ভূমিকম্প বলে। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের দুটো দিক যথা - প্রকৃতি নিজের সৃষ্টিকে নিজেই বিপযস্ত করে। যেমন - ভূমিকম্প, বন্যা, দাবানল, আগ্নেয়গিরির অগ্নুৎপাত প্রভৃতি। দুই - মানুষের সৃষ্ট প্রাকৃতিক বিপর্যয় যেমন - ঘূর্ণিঝড় বা যেকোন ধরণের বিপর্যয়ের পরে মানুষ ব্যাপকভাবে গাছপালা ছেদন করতে পারে। অপরিকল্পিত ভাবে নগরায়ণ (বহুতল বাড়ী নির্মাণ), জলাভূমি ভরাট প্রভৃতি।

সাম্প্রতিক ঘটে যাওয়া ভূমিকম্পের ফলে মারাত্মক ক্ষতি হয়েছে উত্তরসিকিমে। গোটা উত্তরপূর্বাঞ্চল, উর্ত্তর ভারতের মানুষ টের পেয়েছেন এই ভূকম্পের তীব্রতা। এখনও পর্যন্ত সারা ভারতের মৃত্যুর সংখ্যা ৫৭ নেপালে মৃতের সংখ্যা ৭। সংখ্যা আরও বাড়তে পারে। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ক্রমশ বাড়ছে। প্রশাসনিক স্তরে তৎপরতা চলছে কিভাবে উদ্ধারকার্য আরও ভালোভাবে করা যায়, কোথাও কোথাও সেনা নেমেছে।

কিন্তু কেন এই জোর মাত্রায় ভূমিকম্প হল? ভূমিকম্প বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন গ্যাংটক থেকে ৫৫ কিলোমিটার দূরে সিকিম নেপাল সীমান্তের মঙ্গনে। ৬.৮ রিখটার স্কেলে তীব্রতার ভূমিকম্পের কারণ হিমালয়ের পাথরের নীচে ভারতীয় প্লেটের সঙ্গে তীব্বতীয় প্লেটের রেষারেষি বহু বছর ধরেই চলছে। ১৯৬৫ এবং ১৯৮০ সালে যথাক্রমে ৫,৯ ও ৬.০ মাত্রায় ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে। সাধারণত ১০ থেকে ২০ বছর অন্তর এই রেষারেষি হয়।

গত ১৮ সেপ্টেম্বর ২০১১ সন্ধ্যে ৬টা ৯ মিনিট **১০ মিনিটে** প্রবল মাত্রায় ভূমিকম্পে সিকিম, নেপাল, দার্জিলিং, শিলিগুড়ি ও কোচবিহার সহ গোটা উত্তরবঙ্গেই জোর ভূমিকম্প অনুভূত হয়। আগামী কয়েক দিনের মধ্যে পুরো ক্ষয় ক্ষতির পরিমাণ জানা যাবে।

ভূমিকম্প প্রতিরোধে কি কি করা প্রয়োজনঃ—

১) অবৈধ নির্মাণ কার্য বন্ধ করা প্রয়োজন। ২) প্রতিটি বহুতল বাড়ীর তৈরির আগে ভূমিকম্প প্রতিরোধ মূলক ব্যবস্থা নেওয়া দরকার। ৩) ভূতাত্তিক বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ মেনে নির্মাণ কার্য করা উচিত। ৪) প্রাকৃতিক বিপর্যয় মোকাবিলা করার জন্য সরকারী ব্যবস্থাকে আরও আধুনিকরণ ও তৎপরতা অবলম্বন করতে হবে। ৫) ভূমিকম্প প্রবণ অঞ্চলগুলিকে চিহ্নিত করে আগাম সতর্কতা মূলক ব্যবস্থা করা উচিত। ৬) প্রতিটি জেলাস্তরে প্রাকৃতিক বিপর্যয় মোকাবিলা করার জন্য সাধারণ যুবক যুবতীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা দরকার এবং প্রশাসনের এ বিষয়ে দ্রুত মোকাবিলা করার জন্য প্রযুক্তিগত ব্যবস্থা রাখতে হবে।

সাদা বাঘ

1 পাতার পর

সাদা বাঘ আছে? এমন অসংখ্য প্রশ্ন নিশ্চয়ই তোমাদের মনেও জাগে। তোমাদের কৌতুহল মেটাতেই আজ বাংলার সাদা বাঘের গল্প!

বাংলার সাদা বাঘ আবিষ্কার ঃ—

তখন ভারতে চলছে ব্রিটিশরাজ। ব্রিটিশ করদ রাজ্য রেওয়া-র রাজা ছিলেন শিকারপ্রিয় গুলাব সিং। তাঁর সুযোগ্যপুত্র মহারাজা মার্তন্ড সিং তাঁর বন্ধু যোধপুরের মহারাজা অজিত সিং-কে সাথে নিয়ে ১৯৫১ সালে জঙ্গলে বাঘ শিকারে যান। হঠাৎই তাঁর নজরে পড়ে একটা সাদা বাঘিনী। মার্তন্ড সিং অব্যর্থ নিশানায় গুলি ছুঁড়ে সাদা বাঘিনিটিকে হত্যা করেন। একটু পরেই লক্ষ্য করেন কাছেই রয়েছে বাঘিনিটির চারটি বাচ্চা। অবাক কান্ড, বাচ্চাগুলোর তিনটের রঙ হলুদ, আর একটার রঙ সাদা। নির্দয় মার্তন্ড সিং হলুদ বাচ্চাগুলোকে এক এক করে গুলি করে মারেন। তারপর বন্ধু অজিত সিং-কে অনুরোধ করেন সাদা বাচ্চাটিকে গুলি করার জন্য। অজিত সিং করুনাবশতঃ গুলি করতে অসম্মত হন। এই সুযোগে সাদা বাচ্চাটি পালায়। খোঁজ খোঁজ, শেষে হদিশ মিলন পাথরের একটা বড় ফাটলে। কিন্তু ভয়ে সে বেরোয় না। শেষে একটা খাঁচা এনে দরজা খুলে, আর ভেতরে জল রেখে ফাটলের মুখে রাখা হল, কয়েক ঘন্টা অপেক্ষার পর তৃষ্ণার্ত বাঘ শাবকটি জল পান করতে খাঁচায় ঢুকতেই বন্দি। এরপর বাঘের বাচ্চাটিকে মহারাজা মার্তন্ড সিং গোবিন্দগড়ে তাঁর অব্যবহৃত প্রাসাদে নিয়ে আসেন। মহারাজা ওই সাদা বাঘ শাবকটির নাম দেন 'মোহন'। আর আজ বিশ্বের যেখানে যতগুলো বাংলার সাদা বাঘ রয়েছে তারা সবই ওই মোহনের বংশধর।

আকার, আর স্বভাব চরিত্র ঃ—২-৩ বয়সের মধ্যেই বাংলার বাঘ তার পূর্ণ আকৃতি পায়। পুরুষ বাঘের ওজন হয় প্রায় ২০০-২৩০ কেজি, আর লম্বা হয় প্রায় ৩ মিটার। স্ত্রী বাঘের ওজন হয় ১৩০-১৭০ কেজি এবং লম্বায় প্রায় ২.৫ মিটার।

যদিও বলা হয় সাদা বাঘ, তবে প্রকৃত সাদা নয়, সাদা বাঘ বলতে আসে সাইবেরিয়ার বাঘকেই বোঝায়, বাংলার সাদা বাঘ আসলে চিনচিলা () বাঘ। মানুষের ক্ষেত্রে শ্বেতি হলে যেমন হয় ব্যাপারটি অনেকটা সেরকম। তাই বিজ্ঞানের পরিভাষায় এই বাঘকে সঠিকভাবে বলা যেতে পারে চিনচিলা অ্যালবিনিস্টিক () বাঘ। সাদা জমির কালো ডোরাকাটা গা। এই ডোরাদাগ দুটো বাঘের ক্ষেত্রে কখনো হুবহু এক হয় না, যেমনটি দু'জন মানুষের আঙুলের ছাপও () এক হয় না। আরও মজার ব্যাপার, কালো ডোরার ক্ষেত্রে শুধু লোমই কালো রঙের হয় না, ওই লোমের নিচে ত্বক-ও কালো রঙের হয়। তাছাড়া ওদের দু'কানের পেছনে কালোর মাঝে এমন একটা সাদা দাগ থাকে যে পেছন থেকে দেখলে চোখ বলে মনে হবে।

বাংলার সাদা বাঘের চোখের রঙ হয় নীলাভ, আর নাক ও পায়ের থাবার প্যাডের রঙ হয় গোলাপ। এর ফলে বাংলার সাদা বাঘকে দেখতেও অপূর্ব লাগে।

দেখা গেছে, হলুদ বাঘের চেয়ে বাংলার সাদা বাঘ অনেক দ্রুত বৃদ্ধি পায়, এরা সাঁতারে খুব পটু, তবে গাছে উঠতে তত দড় নয়। এরা খুব দ্রুত বৃদ্ধি পায়। এরা সাঁতারে খুব পটু। তবে গাছে উঠতে তত দড় নয়। এরা খুব দ্রুত দৌড়োতে না পারলেও গতিবেগ স্থির রেখে অনেকক্ষণ দৌড়োতে পারে। ফলে তাড়া করে শিকার ধরতে খুব সমস্যা হয় না। প্রজনন ঋতু আর মা-শিশু ছাড়া এই বাঘেরা একা একাই থাকে। এদের দৃষ্টিশক্তি ও শ্রবণশক্তি হয় খুব প্রখর। এরা সাধারণত দিনের বেলা জিরিয়ে নিয়ে গোধুলি লগ্নে শিকারের সন্ধানে বেরোয়। এরা মূলত বুনো মহিষ, ছাগল, হরিণ ও বুনো শুয়োরকে খাদ্য হিসাবে শিকার করে। এক একবারে এরা প্রায় ৪০ পাউন্ড মাংস খায়। শিকার ধরার জন্য এদের নখ ও দাঁত হয় খুব ধারালো ও তীক্ষ্ম। এদের দাঁতের সংখ্যা ৩০টি, আর দাঁতগুলো গড়ে ২.৫-৩ ইঞ্চি লম্বা। খাবারের সন্ধান ছাড়া এরা মোটেই ঘোরাফেরা করে না। ভীষণই ঘুমকাতুরে এরা। দিনে ১৬-১৮ ঘন্টা ঘুমনো চাই-ই।

সাদা হওয়ার চাবিকাঠি ঃ—

হলুদ রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার থেকে সাদা বাংলার বাঘ সৃষ্টির মূলে রয়েছে একটি প্রচ্ছন্ন জিন। সুদূর অতীতে হলুদ রঙের জন্য দায়ী প্রকট জিনের মিউটেশন এর ফলে সাদার জন্য দায়ী প্রচ্ছন্ন জিনটির উদ্ভব হয়। কোনো বাঘ যদি বাবার কাছ থেকে একটি প্রচ্ছন্ন জিন এবং মায়ের কাছ থেকেও ওই প্রচ্ছন্ন জিনটি পায় তা হলে তার রং সাদা হবে। তবে প্রাকৃতিক পরিবেশে এমন ঘটনা হওয়ার সম্ভাবনা খুব কম, কারণ হলুদ রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের জিন পপুলেশনে সাজার জন্য দায়ী প্রচ্ছন্ন জিনটির উপস্থিতির হার অতি সামান্য। তাই হিসেব বলছে, প্রতি দশ হাজার বাঘ জন্মালে তাদের মধ্যে মাত্র একটি সাদা বাঘ হতে পারে। আর ১০০ বছরের মধ্যে প্রভাবে বড় জোর ১০/১২টি সাদা বাঘ জন্মাতে পারে। আরও অদ্ভুত ব্যাপার, পৃথিবীতে একমাত্র রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের জিন পপুলেশনে এই ধরণের মিউটেশন ঘটেছে। পৃথিবীর বাকি চারটি বাঘের প্রজাতিতে এঘটনা এখনও ঘটেনি।

বাংলার সাদা বাঘের ভবিষ্যৎ ঃ—

সম্ভবত : ভারত তো বটেই, পৃথিবীর কোনও অরণ্যে বাংলার সাদা বাঘ আর নেই। আ.সি.এন বাংলার সাদা বাঘকে বিলুপ্ত প্রজাতি হিসেবে ঘোষণা করেছে। বেসরকারী তথ্যে জানা যায় ১৯৫৮ সালে বিহারের জঙ্গলে পৃথিবীর শেষ বাংলার সাদা বাঘকে হত্যা করা হয়।

বিবর্তনের নিয়মে বাংলার সাদা বাঘ প্রাকৃতিক নির্বাচনে বাতিলের তালিতায় চলে গেছে। মিউটেশনের মাধ্যমে হলুদ রঙের জন্য দায়ী জিন থেকে সাদা রঙের জন্য দায়ী জিনের উদ্ভব হলেও সাদার জিনটি প্রতিকূল ভেদ সম্পন্ন () হওয়াঁয় সাদা বাঘেরা প্রকৃতিতে সুযোগ-সুবিধা পায়নি, বরং অসুবিধায় পড়েছে। ভারতীয় আরণ্যক পরিবেশে হলুদ বাঘেরা নিজেদেরকে মিশিয়ে নিয়ে শিকার ও শিকারীর দৃষ্টিকে ফাঁকি দিতে পারে, কিন্তু সাদা বাঘের সে সুবিধা নেই, সে সহজেই শিকার ও শিকারীর দৃষ্টিগোচর হয়। এই প্রতিকূলতাই বিবর্তনে নিয়মে বাংলার সাদা বাঘকে বিলুপ্ত করে দিয়েছে।

আজ গোটা পৃথিবীতে বিভিন্ন চিড়িয়াখানা মিলিয়ে প্রায় ৫০০টি বাংলার সাদা বাঘ রয়েছে। কিন্তু এদের কেউই বুন্য নয়। সবই অন্ত: প্রজলনের

এরপর 5 পাতায়

আন্তর্জাতিক রসায়নবিদ্যা বর্ষ - ২০১১

রসায়নে নোবেলের একশ বছর - ফিরে দেখা

The International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC) ও UNESCO একসাথে ২০১১ সালটিকে আন্তর্জাতিক রসায়নবিদ্যা বর্ষ (International year of Chemistry) হিসেবে পালন করার কথা ঘোষণা করেছেন। ২০০৮ সালের ডিসেম্বরে রাষ্ট্রসংঘের সাধারণসভা ২০১১ সালটিকে আন্তর্জাতিক রসায়নবিদ্যা বর্ষ হিসেবে ঘোষণা করে। ঠিক হয়, এই বছরটি জুড়ে রসায়নের নানা সাফল্য, অগ্রগতি ও মানবজাতির উন্নয়নে এর অবস্থান বিভিন্ন কর্মকান্ডের মাধ্যমে তুলে ধরা হবে।

আন্তর্জাতিক রসায়বিদ্যা বর্ষের স্লোগান ঃ

Chemistry-our life, our future.

মেরী স্কলোডো ওস্কা কুরী (Marie Sklodowsda Curie)-র রসায়ন শাস্ত্রে নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির একশ' বছর পূর্তি এবছরেই। আবার এটি হলো International Association of Chemical Societies (IACS) প্রতিষ্ঠার শতবার্ষিকী। এই দুটি ঘটনার শততম বর্ষ পালনের সিদ্ধান্ত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং সময়োপযোগী। IUPAC এবং UNESCO যথার্থভাবেই বলেছেন, It is time to celebrate the achievements of chemistry and its contribution to the well-being of humankind.

রসায়ন বিদ্যায় নোবেল পুরস্কারের প্রথম একশ' বছরের দিকে ফিরে তাকালে আধুনিক রসায়নবিদ্যার অগ্রগতির একটি পরিষ্কার চিত্র পাওয়া যায়। রসায়নবিদ্যার সকল এলাকাতেই কমবেশি নোবেল পুরস্কার এসেছে। রসায়নবিদ্যার বিভিন্ন এলাকায় গত একশ বছরে যে সকল গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার হয়েছে সেগুলির কয়েকটিকে আবিষ্কারক (নোবেলজয়ী) সহ তুলে ধরার চেষ্টা বর্তমান প্রবন্ধে করা হয়েছে।

ঃ সাধারণ এবং ভৌত রসায়ন ঃ

রাসায়নিক মৌলগুলির পারমাণবিক গুরুত্ব সঠিকভাবে নির্ণয়ের স্বীকৃতিস্বরূপ ১৯১৪ সালে নোবেল পুরস্কার পান থিয়োডোর উইলিয়াম রিচার্ডস (Theodore William Richards)। রিচার্ডসের আবিষ্কার সমস্থানিক (Isotop) চিহ্নিতকরণের কাজকে প্রশস্ত করে। ফ্রান্সিস উইলিয়াম অ্যাস্টন (Francis William Astom) তাঁর তৈরী মাস স্পেকটোগ্রাফ যন্ত্রের সাহায্যে বহু সংখ্যক অতেজস্ক্রিয় মৌলের সমস্থানিক আবিষ্কার করেন। ১৯২২ সালে অ্যাস্টনকে নোবেল পুরস্কার সন্মানিত করা হয়। দুটি ভৌতদশার (যেমন কঠিন ও তরল) অন্তবর্তীদশায় রাসায়নিক ঘটনাবলী সংক্রান্ত গবেষণায় নোবেল পুরস্কার পান ইরভিংল্যাঙমুর (Irvin Langmuir) ১৯৩২ সালে। অনুসমুহের বিশেষতঃ মুক্ত মূলকসমূহের ইলেকট্রনিক গঠন এবং জ্যামিতি অনুসন্ধানে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতিতে ১৯৭১ সালে গেরহার্ড হার্জবার্গ (Gerhard Herzbrerg) কে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়। নিউক্লিয়ার ম্যাগনেটিক রেজোন্যান্স রসায়নে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। ১৯৯১ সালে রিচার্ড আর আর্নেস্ট (Richard R. Ernst) কে হাই রেজোলিউশন নিউক্লিয়ার ম্যাগনেটিক রেসোন্যান্স স্পেকট্রোস্কোপি পদ্ধতির উন্নতি সাধনের জন্য নোবেল পুরস্কারে সম্মানিত করা হয়। আর্নস্টের পদ্ধতি অবলম্বন করে প্রোটিনের মতো বৃহদাকার অণুর গঠন নির্ণয় করা সম্ভব হয়েছে।

ঃ রাসায়নিক তাপগতিবিদ্যা ঃ

১৯২০ সালে ওয়ালথার হারম্যান আর্নেস্ট (WaltherHermann Nernst) কে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয় তাপরসায়ন (thermo chemistry) এ গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্য। তাপগতিবিদ্যার তৃতীয় সূত্রের প্রবক্তা আর্নেস্ট। রাসায়নিক তাপগতিবিদ্যায় গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্য বিশেষতঃ অত্যন্ত নিম্ন তাপমাত্রায় পদার্থের আচরণ সংক্রান্ত গবেষণার জন্য ১৯৪৯ সালে উইলিয়াম ফ্রান্সিস গিয়ায়ুক কে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়। জীবদেহে ঘটে চলা রাসায়নিক বিক্রিয়াসমূহ সাধারণ উভমুখী নয় (Irriversebil)। এই ধরণের বিক্রিয়াগুলির তাপগতি বিদ্যায় গুরুত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতিতে লার্স অনসাগেরকে ১৯৬৮ সালে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়।

ঃ রাসায়নিক পরিবর্তন ঃ

রাসায়নিক পরিবর্তনের কৌশল সম্পর্কে তথ্য পেতে হলে জানতে হয় বিক্রিয়ার হার। বিক্রিয়ার হার নির্ভর করে বিক্রিয়ক পদার্থসমূহের গাঢ়ত্ব, তাপমাত্রার উপর নির্ভরশীলতা, চাপ এবং বিক্রিয়ার মাধ্যমের উপর। রাসায়নিক বিক্রিয়ার কৌশল (Mechanism) এর উপর গবেষণার জন্য ১৯৫৬ সালে সাইরিল নরমান হিনসেলউড এবং নিকোলে নিকোলেভিচ সেমেনতকে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়। ফাস্ট কেমিক্যাল রিয়্যাকশন সম্পর্কিত গবেষণার জন্য ১৯৬৭ সালে নোবেল পুরস্কার পেলেন ম্যানফ্রেড আইগেন, রোনাল্ড জর্জ রেফোর্ড নরিশ এবং জর্জ পোর্টার। ফেমটোসেকেন্ড স্পে কট্রোস্কোপি ব্যবহার করে রাসায়নিক বিক্রিয়াসমূহের ট্রানজিশন্ স্টেট সম্পর্কিত গবেষণার জন্য আহমেদ্ এইচ. জিবাইলকে নোবেল পুরষ্কার দেওয়া হয়।

গোবিন্দ দাস
মোঃ-৮৪২০০৪০৮৫২ / ৯৩৩২৪৩১১০২

চাকদহ বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থার আবেদন

আমরা যারা নদীয়া জেলায় বসবাস করি, তারা জানি যে, নদীয়া জেলায় কল্যাণী শহরে একটি মেডিক্যাল কলেজ গড়ে উঠেছে এবং যার সমস্ত ব্যবস্থাটাই অত্যাধুনিক যা পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য মেডিক্যাল কলেজের থেকে শতগুণে ভাল। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, বর্তমানে তা বন্ধ হতে চলেছে। কারণ কল্যাণী মেডিক্যাল কলেজটি ওয়েস্ট বেঙ্গল ইউনির্ভাসিটি অফ হেলথ সায়েন্স (ডব্লু.বি.ইউ.এইচ.এস.)-এর অধীন। যা পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য মেডিক্যাল কলেজগুলো নয়। এছাড়া জওহরলাল নেহেরু মেমোরিয়াল হাসপাতাল (জে.এন.এম.) এবং কল্যাণী মেডিক্যাল কলেজ এক ছাতারতলায় না থাকার দরুন প্রায় সমস্ত কাজ বন্ধ হওয়ার মুখে এই মেডিক্যাল কলেজ। এছাড়া বিধানসভা নির্বাচনের আগে থেকে নিয়োগের উপর এমবার্গো থাকায় যে সমস্ত পোষ্ট ফাঁকা তাতে নতুন করে নিয়োগ করা সম্ভব হয়নি। ১০০ জন ছাত্র ভর্তি হলেও প্রফেসর, এসোসিয়েট প্রফেসর, ক্লিনিক্যাল টিউটর নিয়োগ হয়নি। যার ফলে মৃত্যু মুখে মেডিক্যাল কলেজ। আমরা অবাক হয়ে লক্ষ্য করছি, প্রশাসনিক ব্যক্তিগণ একদম নীরব। আমরা যারা নদীয়া জেলায় বসবাস করি, বিশেষ করে যারা হাসপাতাল এবং মেডিক্যাল কলেজের ওপর নির্ভরশীল তারা চাইছি এই মেডিক্যাল কলেজ বাঁচুক। আর আমরা যারা মরণোত্তর দেহদান ও চক্ষুদান আন্দোলন করি বা যাঁদের দেহ দান করা আছে, তাঁদের দেহ এবং কর্ণিয়া যেন এই মেডিক্যাল কলেজের অ্যানাটমি বিভাগে পৌঁছতে পারি।

৩৪নং জাতীয় সড়ক সম্প্রসারিত হবে। কলকাতা থেকে ডালখোলা চার লেনের ঝাঁ চকচকে রাস্তা তৈরি হবে। ১৫০ কিমি গতিতে গাড়ি চলবে। খুব তাড়াতাড়ি আমরা দক্ষিণবঙ্গ থেকে উত্তরবঙ্গে পৌঁছে যাব। যাতায়াত থেকে বাণিজ্য সব কিছুরই উন্নয়ন হবে, এটা ঠিকই। কিন্তু কয়েক লক্ষ গাছ কাটা পড়বে এই উন্নয়নের ফলে। সরকারের বৃক্ষচ্ছেদন আইনানুযায়ী একটি বড় গাছ তখনই কাটা যাবে, যখন তার পাশে আর একটি গাছ লাগিয়ে মাঝারি গোছের যখন গাছটি হবে। সরকার নিজেই এই আইন মানছেন না। সারা পশ্চিমবঙ্গে যত প্রধানমন্ত্রী সড়ক তৈরি হয়েছে, তার পাশে একটি গাছও লাগানো হয়নি। রাজারহাট নিউ টাউন, চাকদহ থেকে বনগাঁ যে আন্তর্জাতিক মানের রাস্তা তৈরি হয়েছে তার পাশে বড় বড় গাছ কেটে ফেললেও একটিও নতুন গাছ লাগানো হয়নি। বর্তমান সরকার গাছ লাগানোর পক্ষে এবং জঙ্গল বাঁচানোর পক্ষে মাননীয় পরিবেশ মন্ত্রী মহাশয় বিষয়টি একটু নজর দিন। উন্নয়ন হবে ঠিক কিন্তু কয়েক হাজার কিউবিক ফিট অক্সিজেন থেকে আমরা পৃথিবীবাসীগন বঞ্চিত হব। পৃথিবীর উত্তাপ আরও বৃদ্ধি পাবে।

মাটির তলার জল বিনা অনুমতিতে নির্বিচারে তুলে ফেলা হচ্ছে কোনোরকম সরকারি অনুমতি ছাড়া। পাড়ায় পাড়ায় পঞ্চায়েতে পঞ্চায়েতে বোতল জলের কারখানা তৈরি করা হচ্ছে। ৩০০ ফুট পাইপ বসিয়ে সাবমারসেবেল পাম্প দিয়ে জল তুলে ক্লোরিনেশন (ক্লোরিন দিয়ে) করে ২০ লিটার বড় জারে ভর্তি করে রিক্সা, ভ্যান করে বাড়ি বাড়ি পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে বিশুদ্ধ জল বলে মাসিক ৪০০ টাকা মূল্যে। কিন্তু এই বোতল জল বিশুদ্ধ নয়। অথবা মিনারেল ওয়াটারও নয়। পি.ডি.ডাব্লু (প্যাকেজ ড্রিংকিং ওয়াটার) লিখে বিক্রি করা হচ্ছে, যা সম্পূর্ণরূপে আইন বিরুদ্ধ। আমরা এই বাণিজ্যিকভাবে মাটির নীচের জল তোলার বিরুদ্ধে। বলিভিয়াতে ২000 সাল থেকে পানীয় জল নিয়ে যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। নদীয়া জেলার শ্রীমা মহিলা সমিতি দত্তফুলিয়া অঞ্চলে 'শিবগঙ্গা' ব্র্যান্ড জল উত্তোলক অবৈধ সংস্থাকে বন্ধ করতে বাধ্য করেছে। বহু বহুজাতিক সংস্থা বাংলার ভূ-গর্ভস্থ জল লুটের পরিকল্পনা গ্রহণ করে ফেলেছে এবং সারা পশ্চিমবঙ্গে একর একর জমি তারা কিনছেন এই জল ব্যবসার জন্য। সরকারিভাবে 'জল ধর, জল ভর' এই ধরণের শ্লোগান থাকলেও বৃষ্টির জল সংরক্ষণের জেলাওয়ারি কোনো পরিকল্পনা লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। আমরা চাই এলাকার গাছ কাটা এবং বাণিজ্যিকভাবে জল উত্তোলনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সামিল হউন।

আমরা চাই মায়ের আঁচলের মতো একটা পৃথিবী যা সবাইকে সুস্থ ও সুন্দর রাখবে।

সূর্য শহর

৬০টি সূর্য শহর তৈরি হতে চলছে ভারতে। সূর্যের আলো ব্যবহার করে এই শহরগুলিতে বিদ্যুৎ তৈরি ও তার ব্যবহার হবে। এর সঙ্গে শহরগুলিতে আরো কিছু শক্তি সংরক্ষণকারী ব্যবস্থা তৈরি করা হবে। এর মধ্যে রয়েছে বায়ুশক্তি, পুর বর্জ্য ইত্যাদির ব্যবহার। এর ফলে শহরগুলিতে প্রচলিত বিদ্যুতের ব্যবহার ১০ শতাংশের মতো কমে যাবে - এমনই আশা করছেন কেন্দ্রীয় অপ্রচলিত শক্তি দফতরের মন্ত্রী ড. ফারুক আবদুল্লা। একাদশ পাঁচশালা পরিকল্পনার মধ্যে ১৪টি মডেল সূর্য শহর তৈরি হবে। সেপ্টেম্বরের ২ তারিখে লোকসভায় এক প্রশ্নের উত্তরে ড. আবদুল্লা একথা জানান। তিনি আরো জানান, উৎসাহী পুরসভাগুলির মাস্টার প্ল্যান এবং তার প্রয়োগের জন্য সহায়তা, সচেতনতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি ইত্যাদির জন্য মন্ত্রক থেকে ৫০ লাখ টাকা করে দেওয়া হবে। তিনি জানান, এখনো অবধি বিভিন্ন রাজ্যের রাজধানী সহ মোটা ৩৬টি শহরে এই কাজ শুরু হয়েছে।

বিরল ডাক্তারবাবু

৬ পাতার পর

ছিলেন। তাঁর কোনো বইয়ের ওপর ডাঃ সুজিত দাশ কথাটি লেখা থাকত না। তাঁর লেখা বই 'দরকারি ওষুধ', 'ডাক্তার বনাম রোগী' আজও দারুন প্রাসঙ্গিক। 'ওষুধের কবলে ভারতবাসী', 'নিষিদ্ধ ওষুধ' পড়লে বর্তমান ঔষধ নীতি ও বহুজাতিক আগ্রাসনের স্বরূপ প্রকাশ পায়। ডাক্তার হয়েও তাঁর কাজকর্মের এত বৈচিত্র্য তা ভাবা যায় না।

যেমন ১৯৮৪ সাল, ইউনিয়ন কার্বাইডের ভোপাল কারখানায় মিথাইল আইসোসয়োনেট গ্যাসলিক হয়ে যায় এবং ২৫,০০০ মানুষ মারা যান। সেই সময় **'No More Bhopal Committee'** তৈরি হয় বিভিন্ন বিজ্ঞান ক্লাব ও গণসংগঠনের সহযোগে। প্রতিবাদে ফেটে পড়ে সারা দেশের সাথে কলকাতাসহ পশ্চিমবঙ্গ। সেই আন্দোলনের সুপ্রিম কোর্টে নিয়োজিত বিশেষজ্ঞ কমিটির অন্যতম পুরোধা ছিলেন সুজিত দাশ।

১৯৯৩ সালে, ক্ষেতমজুর সমিতির নেতৃত্বে সুপ্রিম কোর্টে হাকিম শেখ মামলার যে রায় প্রকাশ পায় তার প্রায় পুরো লড়াইতে সুজিত দাশের অবদান অনস্বীকার্য। ঐ রায়ে সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ দেয় কোনো জরুরী বা মুমূর্ষু রোগীকে পরিষেবা না দিয়ে কোনো হাসপাতাল, নার্সিংহোম বা কোনো স্বাস্থ্যপরিষেবা কেন্দ্র ফেরাতে পারবে না। এই আদেশ এখনও বলৎ আছে।

ডাক্তারদের সংগঠন হেল সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশন আর ড্রাগ অ্যাকশন ফোরাম ওনার হাতেই তৈরি। ডাক্তারদের প্রকৃত শিক্ষিত আর বিজ্ঞানমনস্ক করার জন্য ড্রাগ ডিজিজ ডক্টর তাঁর উদ্যোগ।

দূরদর্শণের খোঁজখবর অনুষ্ঠানটির মধ্য দিয়ে বসন্ত জানার কথা সবাই জানেন কিন্তু ১৯৪৯ থেকে যামিনী রায় বসন্ত জানার আঁকা ছবি নিয়মিত চেয়ে নিয়েছেন এবং নিজের কাছে রেখে দিয়েছেন তা একটাও ফেরৎ দেননি, কাউকে দেখাননি ও কোনো প্রদর্শনীও করেননি।

সুদূর মেদিনীপুর জেলার জগন্নাথপুরের গেঁয়ো মানুষের এই বিরল প্রতিভা ঘুনাক্ষরে কাউকে জানতে দেননি যামিনী রায়। এই বিষয়টি নিয়েও এত গভীর কাজ সুজিত দাশের তা 'শিল্পরহস্য : বসন্ত জানার কথা' এই বইটি পড়লে উপলব্ধি হবে।

১৪ই জানুয়ারি, ১৯৩৭ সালে তাঁর জন্ম। মাত্র ৭৩ বছর বয়সে মারা গেলেন এই মানবিক ডাক্তারবাবু। তাঁর দেহ ২১শে এপ্রিল ২০১১ দুপুর ১২টায় কলকাতা মেডিকেল কলেজের এ্যানাটমি বিভাগে তুলে দেওয়া হল চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নতি সাধনের জন্য। যখন সমাজের সমস্ত শ্রেণির মধ্যে ডাক্তারদের প্রতি ঘৃণা বর্ষিত হয়, তখন এই ধরণের মৃত্যু আমাদের কষ্ট দেয়।

তাই প্রতুল মুখোপাধ্যায় চিৎকার করে গান ধরেন 'সব মরণ নয় সমান।'

—বিবর্তন ভট্টাচার্য
বিজ্ঞানকর্মী, চাকদহ বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থা,
মোঃ ৯৪৩৪১১০৯৬৯

এ কেমন গান্ধি - রবীন্দ্রবাদী ?

প্রসঙ্গ : মনি ভৌমিক - পদার্থ বিজ্ঞানী

বিজ্ঞানে ঈশ্বরের সংকেত (**Codde Name God : The Spritual Odyssey of a Man of Science**)। মনি ভৌমিক। অনুবাদ - রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়। আনন্দ পাবলিশার্স। গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ — আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র প্রথম প্রকাশ ২০০৫। ভারতে প্রথম প্রকাশ ২০০৬। প্রথম আনন্দ সংস্করণ - ২০১০; ৩য় মুদ্রন - ২০১০, ১৫০ টাকা, ২২৪ পৃষ্ঠা।

বইটি এক নিঃশেষে পড়ে ফেলা যায়। সাহিত্যিক রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহজ-স্বচ্ছন্দ অনুবাদ পড়তে পড়তে সংশয় জাগে ইংরাজি গ্রন্থও কি এমন পাঠ তৃপ্তিতে ভরপুর ? নাকি অনুবাদক নিজেই সৃষ্টি করেছেন এমন আবহ যা পাঠককে সম্মোহিত তীব্র মনোযোগে পড়তে বাধ্য করে। যা হোক, মূল ভাবনায় প্রবেশ করা যাক।

বইটির সংক্ষেপে, কিন্তু অতি-সচেতনতার মোড়কে পদার্থবিজ্ঞানী মনি ভৌমিকে খুঁজে পাওয়া যায়। এই জানাটা আমার মতো পাঠকের কাছে আগ্রহের বিষয়। জন্মসূত্রে দরিদ্র, ম্যাট্রিকুলেশন পাশ পর্যন্ত জুতো কেনার সাধ্য হয়নি। বৃত্তি নিয়ে ম্যাট্রিক পাশ করে কলকাতার স্কটিশ চার্চ কলেজ থেকে আই এস সি, বি এস সি, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পদার্থবিজ্ঞানে এমএসসি। গ্রামে ফিরে মাস্টারি। খড়গপুর আই আইটিতে গবেষণার জন্য ফেলোশিপ প্রাপ্তি, মাসিক ১৫০ টাকা (আমার থাকা-খাওয়ার খরচের জন্য ১৫০ টাকার মাসিক ভাতা, একসঙ্গে এত টাকা আগে দেখিনি। পৃঃ ৯৯) বলা হয়নি ওঁর বাবা গুণধর ভৌমিক ছিলেন স্কুল শিক্ষক ও স্বাধীনতা সংগ্রামী কট্টর গান্ধিবাদী, জেল খেটেছেন। পরিবার লাঞ্ছিত হয়েছে বৃটিশ পুলিশের হাতে। চার বছর পর বিদেশ পাড়ি (১৯৫১)। গবেষণায় অত্যাশ্চর্য প্রযুক্তি সাফল্য।

খড়গপুর গবেষণার বিষয় ছিল — ইলেকট্রনিক এনার্জি ট্রান্সফার। এই গবেষণার সূত্র ধরেই পৌঁছে গেলেন লেজার প্রযুক্তির অত্যাধুনিক উদ্ভাবনে। ১৯৬১ জেরকসস্ ইলেকট্রো - অপটিক্যাল সিস্টেমস এর রিসার্চ সদস্য। এখানেই তাঁর প্রথম ঘোষণা কিলেট () লিকুইড লেজার উদ্ভাবনা। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ। প্রকাশিত গবেষণা নিবন্ধের সংখ্যা ৫০-এর বেশি।

১৯৩৮ যুক্ত হন নরথ্রগ কর্পোরেট গবেষণা কেন্দ্রে। পরবর্তীতে উন্নীত হন লেজার টেকনোলজির ম্যানেজারের পদে। এখানেই তিনি আবিষ্কার করেন এক্সিমার লেজার চোখের তারার স্বচ্ছ আবরণের উপর সূক্ষ্ম অপারেশন। এই অপারেশনকে বলা হয় (**Corlel Sculpling**)। এক ধরণের চোখের শল্য চিকিৎসা। যাকে জনপ্রিয় করেছে (**Lasik**) ল্যাসিক। এই সব কাজের সূত্রে লব্ধ বৈজ্ঞানিক পেটেন্ট; কোম্পানির শেয়ার স্টক, ক্যানিফোর্ণিয়ায় 'রিয়েল এস্টেট' ব্যবসা (জমি কেনা-বেচা) - '৮০-র দশকের গোড়ায় তাঁকে আমেরিকান ধনীদের অন্যতম মর্যাদাপূর্ণ তালিকায় লিপিবদ্ধ করলো। এক কথায় ধনকুবের। একাধিক রাজকীয় প্রাসাদ, বিলাসবহুল গাড়ি, বাড়িতে পার্টি ও আমোদ - প্রমোদের ফুলঝুড়ি। জীবনকে উপভোগ করতে হবে। ভুলতে হবে জন্মগত দারিদ্র-বঞ্চনা-জাতপাতের অবহেলাজনিত অপমান।

এবারে বইয়ের আসল ভাবনায় প্রবেশ করা যাক। লেখকের মূল উদ্দেশ্য

এরপর 12 পাতায়

স্টিফেন হকিং

একটি অদ্বিতীয় জীবন কথা

আমরা সকলেই কল্পনার জগতে বিচরণ করতে ভীষণ ভালোবাসি। কেউ বা চলে যাই সেই ব্যাঙ্গোমা-ব্যাঙ্গোমির দেশে, আবার কেউ গালিভারের হাত ধরে চলে যাই সেই ছোট্টো লিলিপুটদের দেশে, আবার কেউ কেউ এই বিশ্বব্রহ্মান্ডের বিরাট বিশাল রহস্যের সমাধানের চেষ্টায় কল্পনার যানে চেপে আলোর গতিকে পেছনে ফেলে পাড়ি দিই ব্রহ্মান্ডের অপর প্রান্তের উদ্দেশ্যে। কিন্তু এই জগৎগুলি কল্পনার হলেও রয়েছে পদে পদে বিপদ, আছে প্রাণ সংশয়েরও আশঙ্কা, জীবনের ঝুঁকি, রাক্ষস-খোক্কসের আক্রমণ হলে ব্যাঙ্গোমা-ব্যাঙ্গোমি আছে আমাদের রক্ষার জন্যেও, লিলিপুটদের আক্রমণের সামনে পর্বত প্রমাণ গ্যালিভার দাড়িয়ে থেকে রক্ষা করবে আমাদের। কিন্তু মহাকাশ ? ? ব্লাকহোল, অ্যাস্টেরয়েড, ধূমকেতুর মত দৈত্য-দানবের সামনে কেই বা দাড়িয়ে রক্ষা করবে আমাদের ? আমরা তখন তাহলে নিরূপায় হয়ে নিজের অন্তিম সময়ের অপেক্ষা করব ? — না ! একজন ব্যক্তি আছেন, যার সামনে মহাকাশের কোন রহস্য দাড়াতে ভয় পায়। হুইল চেয়ারে বসা দুরারোগ্য এ.এল.এস. ব্যাধিতে আক্রান্ত, ৭০ বছর বয়সের সেই মানুষটি যার নিষ্পাপ সেই হাসি মুখের সামনে মাথা নত করে মহাবিশ্ব ব্রহ্মান্ড, নিজের শারীরিক ক্ষমতা সম্পূর্ণরূপে হারালেও যার মস্তিষ্কের জোর খুলে দিতে পারে সমস্ত জট, সমাধান করতে পারে যেকোন প্রকার রহস্য, তার নাম 'ডক্টর স্টিফেন উইলিয়াম হকিং'। বৈজ্ঞানিকেরা যে গবেষণার বেশির ভাগটাই করেছেন কল্পনার হাত ধরে, সেই কল্পনাকেই স্টিফেন হকিং দিয়েছেন বাস্তবরূপ ও সঠিক বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা। তিনি মহাকাশ বিজ্ঞানের ও মহাকাশের রহস্য ভেদের এক নতুন পথের দিশারী। এই রকম একজন মানুষের সম্বন্ধে জানার ইচ্ছে কার না নেই, কিন্তু আমরা জানি কজন ? আসুন আজ আমরা পরিচয় করি ডঃ স্টিফেন হকিং এর সাথে।

পৃথিবী তখন উত্তপ্ত !! না, না, এ সেই পাঁচশো কোটি বছর আগের সদ্যজাত পৃথিবীর কথা বলছি না, আমি বলছি সেই সময়ের কথা যখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগুনে পুড়ে ছাড়-খাড় হচ্ছে পৃথিবী। সালটা ছিল ১৯৪২ এবং তারিখ ৮ জানুয়ারী, গ্যালিলিও গ্যালিলিইয়ের তিনশতম মৃত্যুবার্ষিকী। এইদিনেই ইংল্যান্ডের অক্সফোর্ডের জন্মগ্রহণ করেন স্টিফেন হকিং। বাবা ফ্রাঙ্ক হকিং ছিলেন একজন বড় ডাক্তার এবং মা ইসাবেল ছিলেন একজন রাজনীতিবিদ। স্টিফেন মধ্যবিত্ত ঘরে মানুষ হয়েছিলেন, বাবা ফ্রাঙ্ক চিরকাল ছেলেকে দেশের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ স্কুলে পড়াতে চেয়েছিলেন (ওয়েস্টমিনস্টার স্কুল) কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক ভাবে ভর্তির পরীক্ষার দিন স্টিফেন হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ায় তিনি আর পরীক্ষা দিতে পারেননি। ফ্র্যাঙ্ক হকিং হতাশ হয়ে তাই ছেলেকে স্থানীয় একটা স্কুলে (সেন্ট অ্যালবান্স স্কুল) ভর্তি করিয়ে দেন। কয়েক বছরের মধ্যেই স্টিফেন বৈশিষ্ট্য ধীরে ধীরে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে শুরু করে—

মাত্র ষোল বছর বয়সে ১৯৫৮ সালে স্টিফেন হকিং তার দুই বন্ধু ব্যারি ব্লট এবং ক্রিস্টোফার ফ্লেচারের সহায়তায় একটি জটিল কম্পিউটার তৈরি করেন, তারা এর নাম দেন 'লুস'—লজিক্যাল ইউনিসিলেক্টর কম্পিউটিং ইঞ্জিন। এই কম্পিউটার তৈরির খবর স্থানীয় খবরের কাগজে হার্টস অ্যাডভারটাইজার এর মাধ্যমে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে ও তার সাথে ছড়িয়ে পড়ে কিশোর স্টিফেনের প্রতিভা।

ঠিক এর পরের বছর ১৯৫৯ সালে স্টিফেন অক্সফোর্ড ইউনির্ভাসিটিতে ভর্তি হন। বাবা ফ্রাঙ্ক যদিও চাইতেন যে স্টিফেন তারই মত একজন ডাক্তার হোক, কিন্তু স্টিফেনের পছন্দ ছিল পদার্থবিজ্ঞান ও গণিত। এখানে স্টিফেনের মেধা এবং প্রতিভার প্রচুর ঘটনা শোনা যায়—

একবার এক প্রফেসার ছাত্রদের এমন একটি উপপাদ্য প্রমাণ করতে দেন যা সঠিকভাবে প্রমাণ করা ভীষণ দুরূহ কাজ। শ্রেণীর সকল ছাত্রদের মধ্যে একমাত্র স্টিফেন সেটি প্রমাণ করে দেখান এবং সেটা তিনি খুব সহজেই করেছিলেন। প্রফেসর অত্যন্ত কৌতুহলে প্রমাণটি দেখতে চান এবং দেখে স্টিফেনের দক্ষতায় তিনি অবাক হয়ে যান। শুধু এটাই নয়, যে কাগজে স্টিফেন সেই প্রমাণটি করেছিলেন সেটা প্রফেসরকে দেখানোর পর স্টিফেন সেই কাগজটাকে বল পাকিয়ে নোংড়া ফেলার জায়গায় ছুড়ে ফেলে দেন। ঐ প্রফেসর সেটি লক্ষ করেন এবং স্টিফেনকে পরে এর কারণ জিজ্ঞেস করায় তিনি প্রফেসরকে বলেন, 'স্যার এই প্রমাণটা আমি আরো হাজার বার করতে পারবো এই বিশ্বাস আমার আছে, আমায় ভুল বুঝবেন না, আমি এক বিন্দুও অহঙ্কারের বশে কাগজটা এভাবে ফেলিনি।' স্টিফেনের এই আত্মবিশ্বাস দেখে প্রফেসর ভীষণ খুশি হন।

অক্স ফোর্ডের শেষ বছরে অন্তিম পরীক্ষায় তিনি প্রথম শ্রেণীতে পাশ করেন এবং আরো পড়াশোনার জন্যে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। এই সময়ে তিনি লক্ষ্য করেন যে তার শরীরে কিছু অসুবিধা দেখা দিচ্ছে। কথা জড়িয়ে যাচ্ছে, গ্লাসে জল ঢালতে গেলে গ্লাসে কম, গ্লাসের বাইরে জল বেশি পড়ছে। তিনি বুঝতে পারছিলেন যে হয়তো কিছু স্নায়ুজনিত রোগ দেখা দিচ্ছে। ডাক্তার দেখালেন, ওষুধও খেলেন; কিন্তু রোগটা কমছে তো নাই, উল্টে অসুবিধাগুলো যেন বেড়েই চলেছে। বিভিন্ন ডাক্তারী পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর স্টিফেনের অসুখটা জানা গেল—'এ এল এস' (অ্যামিওট্রফিক ল্যাটারাল সক্লিয়ারসিস)। এটি সুষুন্না কান্ড এবং মস্তিষ্কের কিছুটা অংশ জুড়ে হয়। শরীরের জীবকোষের শেষ হতে হতে শেষ পর্যন্ত পক্ষাঘাত, কিন্তু এই রোগ চিন্তাশক্তি এবং স্মৃতির কোনরূপ ক্ষতি হয় না।

এরপর ৭ পাতায়

স্টিফেন হকিং

৪ পাতার পর

ধীরে ধীরে অঙ্গপ্রতঙ্গের আর বাকশক্তির ক্ষমতা লোপ পেতে পেতে একেবারে নষ্ট হয়ে যায়। এই রোগের কোন চিকিৎসা নেই। তবে এই রোগ লক্ষে একজনেরও হয় কিনা সন্দেহ। ইংল্যান্ডে এই রোগকে বলা হয় 'মটর নিউরোগ ডিজিজ'। এই রোগের অন্তিম ফল হল নিশ্চিত মৃত্যু। ডাক্তার স্টিফেনকে মাত্র ২ বছর সময় দিয়েছিলেন। কিন্তু ২১ বছর বয়সী দুর্দম স্টিফেন প্রথমের দিকে একটু ভেঙে পড়লেও তারপর বিপুল বিক্রমে তার প্রিয় বিষয় তাত্ত্বিক জ্যোতিঃ বিজ্ঞান নিয়ে ক্রেমব্রিজে পড়াশোনা এবং গবেষণা চালিয়ে যান, সেই সময় ঐ একই বিষয়ের গবেষণায় ক্রেমব্রিজে কর্মরত ছিলেন একজন ভারতীয় বিজ্ঞানী জয়ন্ত বিষ্ণু নারলিকার; নারলিকারের অধ্যাপক প্রখ্যাত জ্যোতিঃ পদার্থ বিজ্ঞানী ডঃ ফ্রেড হয়েল তখন মহাবিশ্ব সৃষ্টি নিয়ে গবেষণা করছেন। তিনি মনে করতেন যে 'বিগ ব্যাং'এর মতো কিছুই হয়নি, এই তত্ত্ব ভুল। তিনি 'স্টেডি স্টেট' তত্ত্ব মানতেন। নারলিকারের সাথে বন্ধুত্বের সুবাদে স্টিফেন ডঃ হয়েলের গবেষণার ব্যাপারে জানতে পারেন এবং এখান থেকেই শুরু মহাশূন্যর রহস্য ভেদি স্টিফেনের প্রথম পদক্ষেপ। লন্ডনের রয়্যাল সোসাইটির একটি সভায় হয়েল তার তত্ত্ব প্রচার করেন। হয়েলের বক্তৃতার শেষে ধীরে ধীরে দাঁড়িয়ে লাঠিতে ভর দিয়ে স্টিফেন বলে ওঠেন, '...আমি অঙ্ক কষে দেখেছি, আপনার তত্ত্বের এই অংশটা ভুল'। একজন তরুন বালকের কথায় ডঃ হয়েল বিন্দুমাত্র কর্ণপাত করলেন না কিন্তু স্টিফেন দমলেন না, স্টিফেন নিজের গবেষণার ফল খুব শিগগির প্রকাশ করলেন এবং এর ফলে তরুন গবেষক হিসেবে তার নাম ভীষণ ভাবে প্রখ্যাতি অর্জন করতে লাগল। ইতিমধ্যে বিজ্ঞানী রজার পেনরাজের ব্লাক হোল নিয়ে গবেষণা স্টিফেনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। স্টিফেন তার পি.এইচ.ডি থিসিসের শেষ অধ্যায়ে পেনরোজের তত্ত্বের নতুন প্রয়োগ দেখান এবং মাত্র তেইশ বছর বয়সে তিনি 'ডক্টর স্টিফেন হকিং' সম্বোধনে সম্মান লাভ করেন।

১৯৬৫ সালের জুলাই মাসে জেন ওয়াইল্ড কে বিয়ে করে স্টিফেন। জেন স্টিফেনের রোগের ব্যাপারে সবই জানতেন। স্টিফেনকে নানা কাজে সাহায্য করতেন তিনি। ১৯৬৬ সালে স্টিফেন আপেক্ষিকতাবাদের ওপর একটি প্রবন্ধ লেখেন 'সিঙ্গুলারিটিজ অ্যান্ড দ্য জিওমেট্রি অফ স্পেস টাইম' যার জন্যে তিনি 'অ্যাডামস' পুরস্কারে ভূষিত হন। ইতিমধ্যে স্টিফেনের শারীরিক অবস্থার অনেকটাই অবনতি হয়েছে। লাঠি অথবা ক্র্যাচের সাহায্যে চলাও প্রায় অসম্ভব। অনিচ্ছা সত্ত্বেও হুইল চেয়ারের আশ্রয় নিতে বাধ্য হলেন স্টিফেন। কথাবার্তাও এতটাই জড়িয়ে যাচ্ছে যে সুবিধার জন্যে স্টিফেনের সঙ্গে এমন ভাবে কথা বলতে হচ্ছে যাতে তিনি শুধু 'হ্যাঁ' অথবা 'না' এ কাজ চালাতে পারেন। কিন্তু তার মস্তিষ্ক যথারীতি ছিল সচল এবং সূক্ষ্ম।

এরপর তিনি পেনরোজের সাথে যৌথ গবেষণা শুরু করেন এবং ব্লাক হোল নিয়ে নিত্য নতুন তত্ত্বের সন্ধান করতে থাকেন। ৭০ এর দশকের শুরুর থেকেই স্টিফেন হকিং এর খ্যাতি বাড়তে শুরু করে। এই সময় ১৯৭৪ এর ১লা মার্চ প্রখ্যাত গবেষণা পত্রিকা 'নেচার'-এ হকিং প্রকাশ করেন এতদিনে তার সবচেয়ে বড় চাঞ্চল্যকর তত্ত্ব, যার নাম তিনি দিয়েছিলেন 'ব্ল্যাক হোল এক্স প্লোশনস্'। তখন বিজ্ঞান মহলে এটাই তত্ত্ব ছিল যে ব্ল্যাক হোল সর্বগ্রাসি, ব্ল্যাকহোল কোন কিছু বিকিরণ করে না। এই প্রবন্ধে ব্ল্যাক হোল সম্পর্কে প্রচলিত তত্ত্বকে অগ্রাহ্য করে গাণিতিক যুক্তি দিয়ে হকিং প্রমাণ করে দেখালেন, ছোট ছোট ব্ল্যাক হোল থেকে যে শুধু তড়িৎ-চুম্বকীয় বিকিরণ বেরিয়ে আসে তা নয়, কয়েকটি শর্ত সাপেক্ষে এই ধরণের ব্ল্যাকহোল বিস্ফোরিতও হয়। স্টিফেন হকিংয়ের এই তত্ত্বের পর যেন বিজ্ঞানী মহল দুভাগে ভাগ হয়ে গেল। একদল করলেন হকিংয়ের পূর্ণ সমর্থন তো আরেকজন করলেন স্টিফেনকে উত্তেজিত আক্রমণ। শেষ পর্যন্ত স্টিফেনেরই জয় হল। স্টিফেনের নামানুসারে ব্ল্যাক হোলের ঐ বিকিরণের নাম দেওয়া হল 'হকিং রেডিয়েশন'। ১৯৭৪ সালের মার্চ মাসে মাত্র বত্রিশ বছর বয়সে স্টিফেনকে রয়্যাল সোসাইটির ফেলো করা হল। এইভাবেই সত্তরের দশকেই বিশ্ববরেণ্য পদার্থ বিজ্ঞানী হিসেবে স্বীকৃতি পেলেন ডঃ স্টিফেন হকিং।

তার খ্যাতি, যশ, নাম যত বাড়তে থাকলো, শারীরিক ক্ষমতা ততই লোপ পেতে থাকল। সাধারণ হুইল চেয়ারের বদলে বৈদ্যুতিক মটরচালিত হুইল চেয়ার ব্যবহার করতে শুরু করলেন তিনি। ১৯৭৭ সালের জানুয়ারী মাসে বিবিসি একটি অনুষ্ঠান প্রচার করে যার নাম ছিল 'দ্য কি টু দ্য ইউনিভার্স'। এই অনুষ্ঠানের বেশির ভাগই ছিল স্টিফেন হকিং এর গবেষণা নিয়ে। এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের কাছে খুব সহজেই পৌঁছে গেলেন স্টিফেন হকিং। এরপর থেকে প্রচার মাধ্যমে স্টিফেনের অনুগত হয়ে পড়ল। তিনি এই সময় প্রচুর সম্মানীয় পুরস্কারে ভূষিত হন। ১৯৭৮-এ স্টিফেন 'অ্যালবার্ট আইনস্টাইন অ্যাওয়ার্ড' পান। এটি সম্মানের বিচারে নোবেলের থেকে কোন অংশে কম নয়। এই সময় স্টিফেন হকিং ওয়ার্নার ইসরায়েলের সাথে যৌথ সম্পাদনায় একটি বই প্রকাশ করেন যার নাম 'জেনারেল রিলেটিভিটি : এন আইনস্টাইন সেন্টিনারি সার্ভে'। স্যার অ্যালবার্ট আইনস্টাইনের জন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে এটি প্রকাশ করেন তিনি (এটি স্টিফেনের লেখা দ্বিতীয় বই। প্রথমটি হল তার প্রিয় বন্ধু জর্জ ইলিসের সাথে যৌথ ভাবে লেখা 'দ্য লার্জ স্ট্রাকচার অফ স্পেস টাইম' (১৯৭০))। ১৯৮১ সালে স্টিফেনের সম্পূর্ণ একক ভাবে লেখা বই তিনি প্রকাশ করেন, 'সুপার স্পেস এন্ড সুপার গ্রাভিটি'।

১৯৮৩ সালে বিবিসি-এর 'হরাইজন' অনুষ্ঠানে হুইল চেয়ারে বসা হকিংকে প্রথম প্রত্যক্ষ করেন সাধারণ জনগন। দেখানো হয় তার দৈনন্দিন জীবনযাত্রা, স্ত্রী ও তিন ছেলেমেয়ে রবার্ট, লুসি ও টিসোথি, স্টিফেনের গবেষণা, ক্লাস নেওয়া, ছাত্রদের সঙ্গে কথা বলা ইত্যাদি। জনমানুষের মধ্যে স্টিফেন প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলেন বরাবরের জন্য।

খ্যাতি বাড়ছিল বটে, কিন্তু একই সঙ্গে সংসার ও গবেষণাজনিত বিভিন্ন কারণে বেড়ে উঠছিল আর্থিক সংকট, তার চিকিৎসাতেও পড়ছিল খামতি। এই প্রথম স্টিফেন অর্থের উদ্দেশ্যে বই লিখতে শুরু করলেন,

একটিই বই লেখেন। উনি মনে প্রাণে এমন একটি বই লিখতে চেয়েছিলেন যেটা হবে সর্বকালের সেরা। প্রথমে তিনি বইটির নাম দেন 'দ্য ভেরি আলি ইউনিভার্স'। কিন্তু বইটা ছিল ভীষণ টেকনিক্যাল। বই এর প্রতিটি পাতায় ছিল একটি করে সমীকরণ। ক্রেমব্রিজ ইউনির্ভাসিটি প্রেসের সায়েন্স ডিরেক্টর সাইমন মিটন বইটির খসড়া পান্ডুলিপি দেখে স্টিফেনকে বলেন 'তোমার বইয়ের এক-একটা সমীকরণের জন্য বিক্রি অর্ধেক কমে যাবে। ওগুলো দেখেই পাঠত ভাববে—ওরে বাবা, এতে এত অঙ্ক রয়েছে! ব্যস, তক্ষুনি সেই বইটা রেখে দেবে।' মিটনের মতামতকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছিলেন স্টিফেন। তিনি পান্ডুলিপি সংশোধন করে বইতে মাত্র একটি সমীকরণ (আইনস্টাইনের $E=mc^{২}$) রেখে বইটির নাম পরিবর্তন করে রাখলেন—'এ ব্রিফ হিস্ট্রি অফ টাইম ঃ ফ্রম দ্য বিগ ব্যাং টু ব্ল্যাক হোল্স'। প্রকাশিত হওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বেস্ট সেলার তালিকায় জায়গা করে নিয়েছিল বইটি। জনপ্রিয় বিজ্ঞানের কোনও বই কখনও এমন জনপ্রিয়তা পায়নি। 'এ ব্রিফ হিস্ট্রি অফ টাইম' প্রকাশনার জগতে অতীতের সমস্ত রেকর্ড ভেঙে তৈরি করল নতুন ইতিহাস। আজও এই বইটির থেকে বেশি বিজ্ঞানের আর কোন বই বিক্রি হয় না।

১৯৮৫-এর পর পর স্টিফেনের শারীরিক অবস্থার ভীষণ অবনতি হতে শুরু করে। ডাক্তাররা স্টিফেনের ট্র্যাকিওস্টোমি অপারেশন করতে বাধ্য হন ফলে তিনি চিরকালের মত নিজের বাক শক্তি হারান। নিজের প্রিয় বৈজ্ঞানিকের পাশে এগিয়ে আসেন প্রচুর ভক্ত। ক্যালিফোর্নিয়ার এক কম্পিউটার বিশেষজ্ঞ ওয়লিট্ ওল্টোম্ৎস স্টিফেনকে 'ইকোয়লাইজার' নামে একটি প্রোগ্রাম পাঠান। স্টিফেন বাড়িতে ও অফিসে যে কম্পিউটার ব্যবহার করতেন, এই প্রোগামটি সেখানে উপযোগী ছিল। এতে ৩০০০ এরও বেশি শব্দ ছিল। হাতে ধরে একটা সুইচের সাহায্যে তা থেকে খুশি মতো শব্দ বেছে নিয়ে একটি বাক্য সম্পূর্ণ করে বাক্যটি ভয়েস সিনথেসাইজারে পাঠানো হয়। তখন একটি যান্ত্রিক কণ্ঠস্বর বাক্যটি উচ্চারণ করে। সুতরাং তারপর থেকে এই কম্পিউটার কণ্ঠস্বরের সাহায্যেই স্টিফেন সকলের সাথে ভাব বিনিময় করতে থাকেন। 'এ ব্রিফ হিস্ট্রি অফ টাইম' এখনো বেস্ট সেলার তালিকায় শীর্ষে। এমনকি কোন সিনেমার নায়ক বা পপ স্টারের জীবনীর থেকেও যখন এর বিক্রি বেশি তখন এর গুরুত্ব যে কতটা তার বলার অবকাশ রাখে না।

আজও তিনি মহাকাশ বিষয়ক গবেষণায় কর্মরত। দূরারোগ্য এএলএস তাকে যতই আঁকড়ে ধরুক না কেন, তার গতিকে রূদ্ধ করতে পারেনি। স্টিফেন হকিং ক্রেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের লুকাসিয়ান প্রফেসর পদেও অনেকদিন ছিলেন, প্রায় সাড়ে তিনশো বছর আগে যে পদ অলঙ্কৃত করেছিলেন স্যার আইজাক নিউটন, মূর্তির মত স্তব্ধ ঐ দেহ নিয়ে হুইল চেয়ারে বসেই তিনি পদে পদে সমাধান করে চলেছেন মহাবিশ্বের গূঢ় রহস্য। জীবনে তিনি হার মানতে শেখেননি। তাঁর গবেষণা অক্লান্ত। তিনি শুধু বিজ্ঞানের জন্যেই নয়, তার মত এমন জীবন হয়ত বিশ্বের আর কোন ব্যক্তিত্বের মধ্যে পাওয়া যায় না। তিনি অদ্বিতীয়। তাই আজও তার লেখা বই-ই বেস্ট সেলার। তার নিজের ওপর আত্মবিশ্বাস এতই দৃঢ় যে, যখন আজকের প্রকৃতি, পরিবেশ, পরিস্থিতি মূল্যায়ন করে বিজ্ঞানি মহল বলছে যে মানুষের হাতে হয়তো আর আশা নেই, এই হতাশাতেও একমাত্র স্টিফেন হকিং মানুষের অন্ধকার পথে আলোর মত বলেন, —"হয়ত মানবজাতির এখনও আশা আছে। মানুষের বিজ্ঞান চেতনা এখনো হারিয়ে যায়নি।" আসুন আজ আমরা সকলে তার দীর্ঘায়ু কামনা করি।

কিঞ্জল কুমার বিশ্বাস, মোঃ-৯৩৩০৫৫৯৭৭৩

সূত্র : ১) স্টিফেন হকিং একটি অনন্য জীবন—অনীশ দেব।

সাদা বাঘ

4 পাতার পর

মাধ্যমে সৃষ্ট 'মোহন'-এর উত্তরসূরি। এদের জিন ভান্ডার অত্যন্ত সংকুচিত হয়ে গেছে ক্রমাগত অন্ত: প্রজননের (Inbreeding) ফলে। তাই সাদা বাঘেরা বর্তমানে নানা রকম শারীরিক সমস্যায় ভুগছে, যেমন ক্ষীন দৃষ্টি, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা হ্রাস, অ্যানাস্থেসিয়া সহনক্ষমতা হ্রাস, বৃক্কের কর্মক্ষমতা হ্রাস, মেরুদন্ডের বক্রতা, প্রজনন ক্ষমতা হ্রাস ইত্যাদি। সুতরাং আগামী দিনে এইভাবে অন্ত:প্রজননের মাধ্যমে সাদা বাঘকে টিকিয়ে রাখার প্রচেষ্ঠা আদৌ উচিত কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

শেষে, আর একটা আশাজনক সংবাদ দিই, 'মোহন'-এর উত্তরসূরী সাদা বাঘিনী 'সীমা' কে ১৯৭৯ সালের ২৯ আগষ্ট কানপুর চিড়িয়াখানায় আনা হয়। ওখানে আগে 'মোহন'-এক চতুর্থ প্রজন্মের বাঘ 'বাদল'। 'বাদল'-এর অবশ্য রঙ ছিল হলুদ। সীমা ও বাদলের মধ্যে প্রজননের লক্ষ্যে বিজ্ঞানীরা উদ্যোগ নিলেও সফল হতে পারেননি। এই সময় করবেট জাতীয় উদ্যান থেকে ধৃত মানুষ খেকো ভয়ানক হিংস্র বাঘ 'শেরু'-কে বন্দি করে কানপুর চিড়িয়াখানায় আনা হয় এবং 'সীমা'-র সঙ্গে রাখা হয়। সীমা ও শেরুর মধ্যে প্রজনন সফল হয় এবং তাদের তিনটি বাচ্চা হয়। অবাক কান্ড! তিনটে বাচ্চার মধ্যে একটা সাদা!

যদি শেরুর দেহে হলুদ রঙের জন্য দায়ী জিনটি এক জোড়া থাকত তবে মেন্ডেলিয় নিয়মানুযায়ী সব বাচ্চারই হলুদ হওয়ার কথা। কিন্তু একটা সাদা বাচ্চার জন্ম বুঝিয়ে দিয়েছে শেরুর দেহে হলুদ ও সাদা রঙের জন্য দায়ী জিন একটা করে রয়েছে। অর্থাৎ সাদা বাচ্চাটি (ওর নাম দেওয়া হয় জহর) সীমার কাছ থেকে একটা সাদার জিন ও শেরুর কাছ থেকে একটা সাদার জিন পেয়েছে। এই ঘটনা নিশ্চিতভাবেই প্রমাণ করছে যে করবেট জাতীয় উদ্যানে সাদা বাঘেদের জিন ভান্ডারে সাদা রঙের জন্য দায়ী জিনটি এখনও কিছুটা বর্তমান। যদি তাই-ই হয়, তবে অদূর ভবিষ্যতে করবেট জাতীয় উদ্যানে প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্ট সাদা বাঘ দেখা যেতেই পারে। তখন কিন্তু অধুনা 'বিলুপ্ত' বাংলার সাদা বাঘের কাহিনী নতুন করে লিখতে হবে।

সৌম্যকান্তি জানা
কাকদ্বীপ, পূর্ববাজার, দঃ ২৪ পরগনা
মোঃ- ৯৪৩৪৫৭০১৩০

কোচবিহার জেলা হাসপাতালে সাপের কামড়ের ঝাড়ফুঁক-এর নিন্দা ও প্রতিবাদপত্র ও প্রচার কর্মসূচী

সম্প্রতি কোচবিহার মহারাজা জীতেন্দ্রনারায়ণ (জেলা) হাসপাতালে সাপের কামড়ের রোগী অক্ষয় বর্মনকে এক ওঝা ঝাড়ফুঁক করার এক খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। সমীক্ষা করে জানা যায় ১২ সেপ্টেম্বর বিকেলে হাসপাতালে ঐ রোগীর কাছে ২০/২৫জন লোক এসেছিল। ঝাড়ফুঁক করার খবর প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই বিষয়টি নিয়ে বেশ জলঘোলা হয়। খবরে আরো জানা যায় ডাঃ শ্বাশতি ঘোষ ঔ রোগীর চিকিৎসা করেন, অথচ হাসপাতালে ঝাড়ফুঁকের ঘটনাও ঘটেছে।

১৪ সেপ্টেম্বর হাসপাতালের সুপারিন্টেনডেন্ট ডাঃ কল্যাণ কুমার দে মহাশয়ের কাছে পশ্চিমবঙ্গের ৩২টি বিজ্ঞান সংস্থার (যথা কোচবিহার বিজ্ঞান চেনা ফোরাম, বিজ্ঞান অন্বেষক, নোড় কোচবিহার, জংশন ওয়েল ফেয়ার অরগানাইজেশন আলিপুরদুয়ার জংশন, জলপাইগুড়ি সায়েন্স এন্ড নেচার ক্লাব, ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি, মাদারী হাট, জলপাইগুড়ি, চাকদহ বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থা, বিজ্ঞান দরবার, কাঁচরাপাড়া কলিকাতা বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থা, ত্রিবেণী যুক্তিবাদী সংস্থা ও গণবিজ্ঞান সমন্বয় কেন্দ্র, পশ্চিমবঙ্গ সহ ৩২টি বিজ্ঞান ও পরিবেশ সংস্থা) পক্ষ থেকে এক স্মারকলিপি দেওয়া হয়। স্মরাকলিপিতে সুপারের কাছে ৪টি বিবয়ে জানতে চাওয়া হয় যথা—

১) সরকারী হাসপাতালে কিভাবে একজন রোগীর কাছে ওঝা ঝাঁড়ফুঁক করেন। The Drug & Magic Remedies (Objectionable Advertisment) Act, 1954 আইনানুযায়ী ওঝাকে গ্রেপ্তার করা উচিত অথচ তাকে কোন শাস্তি না দিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। অধ্যক্ষ কেন ওঝাকে গ্রেপ্তার করার নির্দেশ দিলেন না।

২) স্মরাকপত্রে হাসপাতালে ঝাড়ফুঁকের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ করা হয়েছে, পাশাপাশি কর্তৃপক্ষের বিস্তারিত মতামত জানতে চাওয়া হয়েছে।

৩) হাসপাতালে আগামী দিনে এ ধরণের অবৈজ্ঞানিক কার্যকলাপ যাতে আর না ঘটে তার জন্য সুপারের কাছ থেকে নিশ্চয়তা প্রদান দাবী করা হয়েছে।

৪) সামগ্রিক ভাবে গোটা ঘটনাটির পূর্ণাঙ্গ তদন্ত রিপোর্টি যাতে প্রকাশিত হয় তার জন্য একটি তদন্ত কমিটি গঠন করার দাবী জানানো হয়। আগামী এক মাসের মধ্যে তদন্ত কমিটির রিপোর্টি সুপারের কাছে জমা দেবার পর সুপারিশগুলি যাতে দ্রুত কার্যকরী হয় তার দাবী জানানো হয়েছে।

হাসপাতালে বিজ্ঞান সংস্থার পক্ষে প্রতিনিধি দলে ছিলেন কোচবিহার বিজ্ঞান চেতনা ফোরামের শেখর ঘোষ, বিজ্ঞান অন্বেষক ও গণবিজ্ঞান সমন্বয় কেন্দ্রের পক্ষে জয়দেব দে, নোড় কোচবিহারের পক্ষে শঙ্কর নারায়ণ দাস এবং জংশন ওয়েলফেয়ার অরগানাইজেশন্ আলিপুরদুয়ার জংশন এর উত্তম দাস প্রমুখ।

দীর্ঘ আলোচনায় হাসপাতালের সুপার ডাঃ দে জানান যে ঐদিন ঝাড়ফুঁক হয়েছে এবং ঘটনাটি পূর্বপরিকল্পিত। হাসপাতালে নিরাপত্তা ব্যবস্থা বেশ ত্রুটিপূর্ণ, একই বেডে এক সঙ্গে অনেক লোকজন ঢুকে পড়েন। তিনি জনসাধারণেকে সচেতন হবার আহ্বান জানান। হাসপাতালে দালাল চক্রেরও তিনি স্বীকার করেন। সাপে কামড়ালে কি করবেন—এ বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গের বিজ্ঞান কর্মীরা দীর্ঘ দিন ধরেই সর্বস্তরে প্রচারাভিযান কর্মসূচী চালিয়ে আসছেন। বিভিন্ন পুস্তিকা, প্রচারপত্র প্রকাশের মধ্যে দিয়ে সচেতনতা বাড়ানোর কাজটি ধারাবাহিক ভাবে চলছে। ওঝারা গাছ-গাছরা বা মন্ত্রতন্ত্র দিয়ে সাপ কাটা রোগী ভালো করে থাকেন বলে দাবী করেন। ওঝারা একমাত্র ভালো করতে পারেন যদি নির্বিষ ও ক্ষীনবিষ সাপে কামড়ায়। এছাড়া বিষধর সাপ যদি মারণ মাত্রার চেয়ে কম মাত্রার বিষ ঢালে সেক্ষেত্রেও ওঝারা সফল হন।

বিষধর সাপে (মারণ মাত্রার বিষ ঢালার ক্ষেত্রে) কামড়ালে একমাত্র ওষুধ অ্যান্টিভেনম সিরাম ইনজেকশন বা এ.ভি.এস ইনজেকশন। পলিভ্যালেন্ট অ্যান্টিস্নেক সিরাম বর্তমানে যেকোন বিষধর সাপে কামড়ালেই প্রয়োগ করা হয়। বিষধর সাপের কামড়ের চিকিৎসার ক্ষেত্রে একমাত্র সফল ওষুধ।

কোচবিহার বিজ্ঞান চেতনা ফোরাম, জংশন ওয়েলফেয়ার অরগানাইজেশন, ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি, মাদারী হার্ট, জলপাইগুড়ি সায়েন্স এন্ড নেচার ক্লাব উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে ও বিভিন্ন অনুষ্ঠানে সাপে কামড়ালে কি করবেন শীর্ষক ধারাবাহিক প্রচার চালাচ্ছেন। প্রতিটি হাসপাতালে সাপের কামড়ের চিকিৎসা সহ জীবন দায়ী ওষুধের পর্যাপ্ত সরবরাহের দাবী জানানো হয়।

—প্রতিবেদন : জয়দেব দে

> ‘সম্পদের প্রতাপে যাঁরা আদর্শ
> জলাঞ্জলি দিয়ে বসে আছে
> তাদের সঙ্গে জীবনে
> কোন সর্ম্পক গড়ব না’।
> —মাদাম কুরি
> (১৮৬৭-১৯৩৪ খ্রিষ্টাব্দ)

এ কেমন গান্ধি - রবীন্দ্রবাদী ?

7 পাতার পর

ধরা পড়ে এভাবে—'বিজ্ঞানের যুগে নাস্তিক হওয়াটাই অবৈজ্ঞানিক।' একদিন বিজ্ঞানই আমাদের ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কে প্রশ্ন তুলতে বাধ্য করেছিল। সেটা ছিল জড়বিজ্ঞান। কিন্তু এখন আধুনিক পদার্থবিজ্ঞান এবং সৃষ্টিতত্ত্ব স্বচ্ছ প্রমাণ দিচ্ছে এমন এক অতীন্দ্রিয় নিরাকার সত্তার - যে সত্তাকে বলা যেতে পারে মহাবিশ্বের সৃষ্টি উৎস।' (পৃঃ ১০)

'আমাদের চারধারের জাগতিক বাস্তবকে যদি ভালভাবে বুঝতে পারি, তাহলে দেখব সারা মহাবিশ্ব জুড়ে রয়েছে এক বিমূর্ত বুদ্ধিমত্তার প্রকাশ। যাকে একই সঙ্গে বলা যায় স্রষ্টা এবং ধারক। প্রাচীন ভারত এই নিরাকার সত্তাকেই উপলব্ধি করেছিল ব্রহ্ম নামে।' (পৃঃ ১০)

আছে আইনস্টাইনের নানা প্রশংসা ও সেই সুপরিচিত উক্তি — 'বিজ্ঞান ধর্ম ছাড়া খঞ্জ / ধর্ম বিজ্ঞান ছাড়া অন্ধ।' একজন দক্ষ উকিল কেমন ভাবে যুদ্ধের ঘুঁটি সাজান, এই বইটির সামগ্রিক নির্মান ও সম্পাদনা তার উজ্জ্বল নজির বিশেষ। শেখারও, খ্যাতনামা পদার্থবিদ হাই সেনবার্গ উদ্ভাবিত, 'অনিশ্চয়তার সূত্র' ও আধুনিক কোয়ান্টাম প্রতিপাদ্য এই যুদ্ধের ব্রহ্মাস্ত্র হিসাবে বারেবারে ব্যবহৃত, বলা যায় পাতায় পাতায়। তাতে কী এলো বা গেল?

একথা তো ঠিকই— সেই চিরন্তন প্রশ্ন, আমরা কোথা থেকে এলাম? জড় ও জীব উভয়েই? ১৪০০ কোটি বছর আগে মহাবিস্ফোরণ। শুরু হোল পদার্থের জন্ম; মহাকাশ তথা মহাশূন্যের বিস্তার। তার আগে কী ছিল? বিজ্ঞান সত্যানুসন্ধানী। সে নিরন্তন খুঁজে খুঁজে এগোয় বা কখনও পিছোয়। কোথা থেকে আদি শক্তি সঞ্চিত হোল? আইনস্টাইনের তত্ত্ব নানা ভাবে দর্শণের বিচারে উপস্থাপিত। যদি মেনেও নেওয়া যায় কোয়ার্কও ইলেকট্রন দিয়ে মহাবিশ্বের বস্তুরাজি গড়া, তাহলেও প্রশ্ন কোয়ার্ক ইলেকট্রন সৃষ্টির আদি কাহিনী কী?

সৃষ্টি তত্ত্বের আলোচনা আছে কমবেশি বইয়ের হৃদয় জুড়ে। লিখছেন, 'কেমন করে ভাববো সেই অনন্য রূপকল্পনার পিছনে নেই কোনও পরিব্যপ্ত বুদ্ধিমত্তা। বরং যতই দেখছি নিখিল বিশ্বের পরিকল্পনা, যতই বিস্তৃত হচ্ছে আমাদের দৃষ্টি এবং উপলব্ধির সামনে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পরিকল্পিত সুসংবদ্ধ রূপ, ততই মনে হচ্ছে যেন সেসব একই হাতের তৈরি, একই সৃষ্টিকর্তা না হলে হয়তো এমন সুসংবদ্ধতা থাকত না লিখিলবিশ্বের বিবর্তনের নকশায়।' (পৃঃ ১২২)।

বইতে প্রবল ভাবে উপস্থিত মহাত্মা গান্ধি। বিজ্ঞানী ভৌমিকের ১২/১৩ বছর বয়সে (সম্ভবত ১৯৪৪-৪৫?) গান্ধিজি বেশ কয়েকদিন তমলুকে ছিলেন। খুব কাছ থেকে ওঁকে দেখার স্মৃতি বিজ্ঞানীর মননে উজ্জ্বল। গান্ধিজীর প্রতি প্রশস্তি পড়তে ভাল লাগে। আবার বারে বারে লিখছেন, 'গীতবিতানের কাছে আমি সব থেকে বেশি ঋণী। পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্পদ বিশেষ। ইত্যাদি। দেশের দরিদ্র নিজের গ্রামের মানুষের প্রতি ভালবাসার কথা, নিজের শিকড়ের কথা বারেবারে উত্থাপিত। ভারতবর্ষের সনাতন ত্যাগ, তিতিক্ষা, নিরাপত্তা ভোগবিলাসহীন জীবনযাপনের প্রশংসাও আছে। একাধিকবার। অথচ কোন এক মনোবিকারগত উন্মাদনায় তিনি আকণ্ঠ জুড়ে আছেন ভোগবিলাসের চরম বৈভবে। এ কেমন গান্ধিবাদী বা রবীন্দ্রানুরাগী?

- বইটি এক হিসাবে চানাচুর গোছের। দারুন মুচমুচে গতিতে বইটা চেখে নেওয়া যায়। আসলে ড. মনি ভৌমিক চান প্রচারের আলোয় উঠে আসতে। মিডিয়ার আকর্ষন যেন থাকে তাঁর উপর। বইটির 'বেস্ট সেলার' করতে যা যা করা প্রয়োজন, নিখুঁত মনোযোগে এবং পরামর্শে তা রূপায়তি করেছেন। সম্পাদনার স্টাইল অবশ্যই শিক্ষণীয়। একারণেই বইয়ের কোথাও বিদ্যাসাগর বা আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের নামটুকু পর্যন্ত অনুচ্চারিত। তাঁর যখন বিহ্বল বিত্ত, সেই অর্থে ভারতে তিনি একক প্রয়াসে অতি-উন্নত লেজার প্রযুক্তি গবেষণা প্রতিষ্ঠান সহজেই গড়তে পারতেন। একথা উঠছে এই কারণেও, তিনি বারে বারে বলেছেন, ভারতবর্ষকে তিনি ভালবাসেন। এই দেশের মানুষের জন্য কিছু করা তাঁর আবশ্যিক আগ্রহের অন্যতম প্রধান। সাধ্য থাকা সত্ত্বেও কিছুই তো করলেন না। সস্তা প্রচার পাওয়া ছাড়া।

ভোগের চরম প্রাচুর্য তাঁকে যে হতাশায় ঠেলে দিয়েছিল, তা থেকে মুক্তি পেতে 'ধ্যানের' মহিমা সবিস্তারে বর্ণিত। এভাবে তিনি মানসিক শান্তি ফিরে পেয়েছেন। এখানেই তো বইটা শেষ করা যেতে পারতো। না! বিশ্বতত্ত্ব, সৃষ্টি রহস্য, কোয়ান্টাম কন্টিনিউটি, কোয়ান্টাম মেডিটেশন, ধর্মীয় সৃষ্টতত্ত্ব, কোয়ান্টাম হৃদয়...এসব শব্দগুচ্ছ ঠিকভাবে ঢোকাতে পারলে বইটা ওজনে সমৃদ্ধ হবে; ব্যবসার পথও সুগম হবে।

বইটি 'সিরিয়াসলি' লেখা একথা কেউই বলবে না। যদি তা হত তাহলে তার বুনন ও প্রকাশ সম্পূর্ণভাবে অন্যরকম হত। হয়তো বা একটা বিকৃত মনন ও স্থূলরুচির উপস্থাপনা এই বই। আধ্যাত্মিকতাকে লেখক মেলাতে চেয়েছেন জীবন প্রয়াসের অন্তর্নিহিত ধারায়। আমাদের পশ্চিমবঙ্গের কিছু যুক্তিবাদী বিজ্ঞানমনস্ক পাঠক এর বক্তব্যের বিরোধিতা করেছেন। এতে বইটা অনাবশ্যক গুরুত্ব পেয়েছে।

—দীপক কুমার দাঁ
গোবরডাঙ্গা গবেষণা পরিষদ, মোঃ- ৯৪৭৪১৯২৭৯৯

যোগাযোগ—বিজ্ঞান দরবার, ৫৮৫, অজয় ব্যানার্জী রোড (বিনোদনগর), পোঃ কাঁচরাপাড়া ৭৪৩১৪৫, উঃ ২৪ পঃ। ফোন : ০৩৩-২৫৮০-৮৮১৬, ৯৪৭৪৩৩০০৯২।

সম্পাদক মন্ডলী—অভিজিৎ অধিকারী, বিবর্তন ভট্টাচার্য, বিজয় সরকার, সুরজিৎ দাস, তাপস মজুমদার, চন্দন সুরভি দাস, চন্দন রায়, কিঞ্জল বিশ্বাস।

স্বত্ত্বাধিকারী ও প্রকাশক জয়দেব দে কর্তৃক ৫৮৫ অজয় ব্যানার্জী রোড (বিনোদ নগর) পোঃ কাঁচরাপাড়া, পিন-৭৪৩১৪৫, জেলা-উত্তর ২৪ পরগণা থেকে প্রকাশিত এবং তৎকর্তৃক স্ক্রীন আর্ট, ২০ নেতাজী সুভাষ পথ, পোঃ কাঁচরাপাড়া, জেলা-উত্তর ২৪ পরগণা থেকে মুদ্রিত।
অক্ষর বিন্যাস : রিম্পা কম্পিউ, কাঁচরাপাড়া হাইস্কুল মোড়, কাঁচরাপাড়া, চলভাষ : ৯৮৩৬২৭১২৫৩
সম্পাদক—শিবপ্রসাদ সরদার। ফোন : ৯৪৩৩৩৩৪৩৮০) *E.mail-ganabijnan@yahoo.co.in*